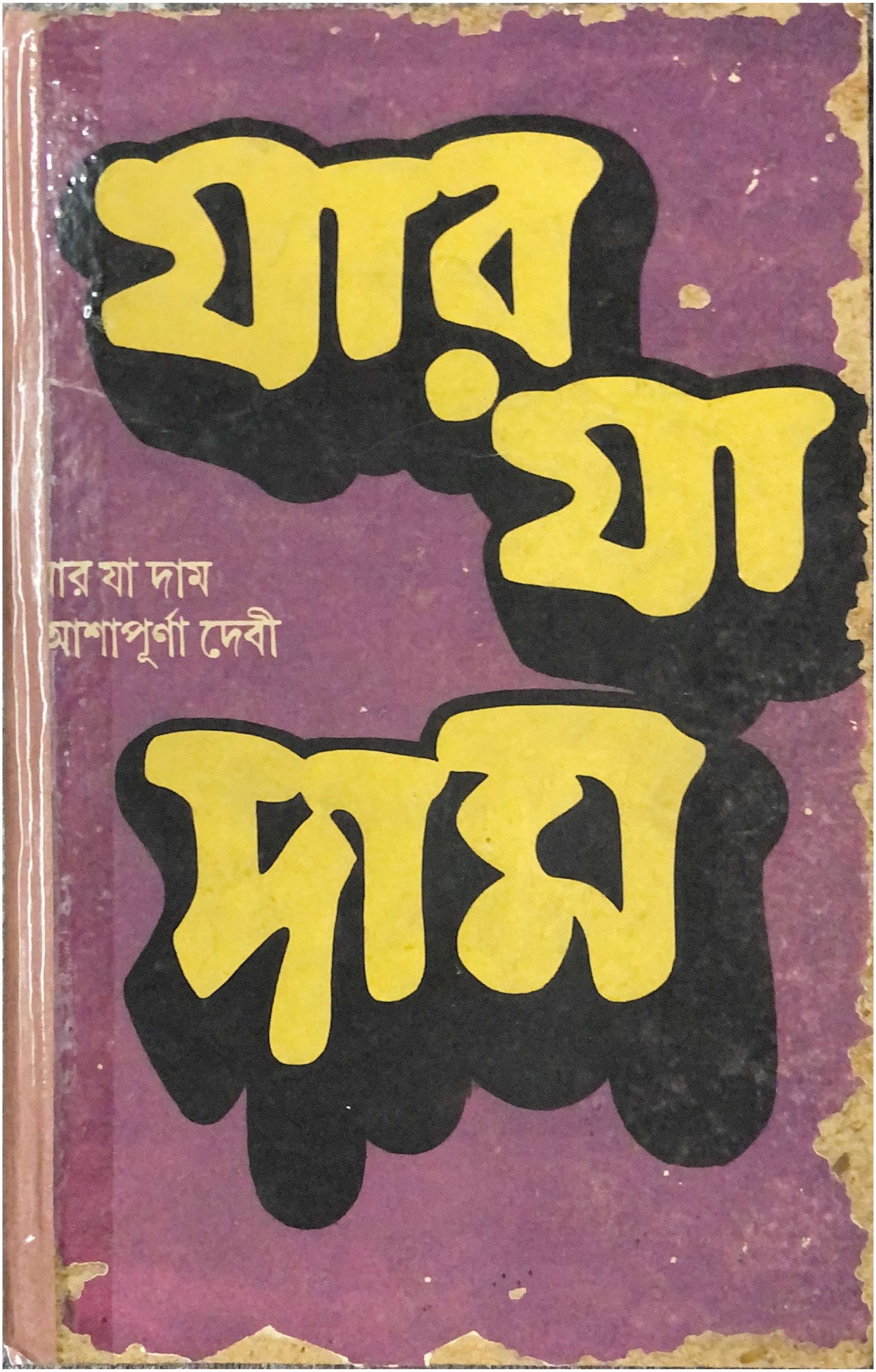

যার যা দাম

ার যা দাম
আশাপূর্ণা দেবী

যার যা দাম

আশাপূর্ণা দেবী

মিত্র ও ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ, পৌষ ১৩৭৯

—পাঁচ টাকা—

Extra Air Freight Taka 1·00

প্রচ্ছদপট ঃ

অঙ্কন ঃ চুনী বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রণ ঃ স্ট্যাণ্ডার্ড ফোটো এনগ্রেভিং

মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও
বি. বি. প্রেস, ১১০।বি অখিল মিস্ত্রী লেন কলিকাতা ৯ হইতে এস. এন. শাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত

প্রিয় বান্ধবী ইন্দিরা-বৌদির
করকমলে

ঘুমটা সবে এসেছিল মাত্র, হঠাৎ বৃষ্টি এল ঝমঝমিয়ে, বিছানায় উঠে বসল রমলা, তারপরই 'সেরেছে' বলে দুদ্দাড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল নিজের ঘরের খোলা জানালা-দরজার দিকে দৃকপাত না করে।

পার্থর ঘরের জানালা নির্ঘাত খোলা আছে, কে জানে পাখাও খোলা আছে কিনা, অথচ খেতে বসে বারে বারে কাশছিল।

রমলার ঘর থেকে পার্থর ঘরে যেতে একটা ফাঁকা বারান্দা পার হওয়া ছাড়া উপায় নেই। ঠাকুর্দার আমলের বাড়ি, মাপে প্রাসাদ সদৃশ না হলেও, প্যাটার্নটা প্রাসাদসদৃশ চকমিলানো, প্রকৃতির হাত থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা নেই। খোলা উঠোন, ফাঁকা বারান্দা, ঘরের মধ্যে দিয়ে অন্য ঘরে যেতে দরজার বালাই নেই। রমলার ঘরের পাশেই বাবার ঘর, সে-ও ঘর খুলে বেরিয়ে বারান্দা দিয়েই যেতে হয়। পার্থর ঘরটা তো আবার আরো ঘুরে সিঁড়ি পার হয়ে।

মাঝরাতে হঠাৎ বৃষ্টি এলে অবশ্য বাবার ঘরে ঢুকে তদারক করার কোন প্রশ্ন নেই, বাবা নিজের ঘরের ভিতর থেকে খিল লাগিয়ে শোন। শুধু খিল নয়, লোহার খিল। এই নিয়ে রমলা আর পার্থ কম হাসাহাসি করে না। অবশ্য বাবার আড়ালে। ঘরের দেওয়ালে গাঁথা লোহার আলমারিটা নিয়েই যে বাবার এত সাবধানতা তা ওরা জানে।

পার্থ সেই হাসাহাসির সময় বলে, দিদি, তুই তো বাবার বিশ্বাসী ভৃত্য, তুই একবার কৌশল করে বাবার কোমরের ঘুনসিতে আটকানো ওই চাবিটা বাগাতে পারিস! তাহলে ভদ্রলোকের আয়রন-চেস্টটা খুলে একবার দেখি কী এত মালকড়ি আছে!

বাপের সম্পর্কে কথা বলতে পার্থ কদাচ বাবা বলে। বলে—ভদ্রলোক, গৃহকর্তা, ডক্‌বাবু। সত্যশরণের চাকরিটা খিদিরপুরের ডকে মাল খালাসের হিসেব রাখা, তাই এই অভিনব নামকরণ। কাজটা যে বিশেষ উচ্চমানের নয়, এ-কথা রমলাও মনে মনে স্বীকার করে, কিন্তু ভাইয়ের ওই অবজ্ঞাসূচক বিশেষণ দেওয়াটা সমর্থন করে

না। রেগেমেগে বলে, ওই ডক্‌বাবুই এই রামরাজত্বটি চালাচ্ছে হে, আর ওই ডকের কল্যাণেই তোমার এত মস্তানি।

সে তো অহরহই কান মুলে স্বীকার করছি বাবা, পার্থ বলে, তবে কিনা কাজটা—মানে বন্ধু-টন্ধুকে বলতে বেশ ইয়ে নয়—এই আর কি।

মানের হানি হয়, কেমন? রমলা সকৌতুকে হাসে, আচ্ছা, এম. এ. পাস করা নামডাকের বাবু ভবিষ্যতে কী করে দেখা যাবে!

পার্থর সঙ্গে যে তার মতের বিশেষ পার্থক্য আছে তা নয়, তবু বাবা বলে কথা, কৃতজ্ঞতা বলেও কথা। এই বাড়িটা না হয় ঠাকুরদার আমলের, কিন্তু বাবা সেই জীর্ণ পুরনোর ওপর কম রূপলাবণ্য আরোপ করেনি, তাছাড়া ছেলে-মেয়ের শখে সাধে সাজসজ্জাতেও আধুনিকতার ত্রুটি রাখেনি।

পার্থবাবুর তো টেরিলিন টেরিকট ছাড়া কথাই নেই। হাতখরচেও সে অফিসার বাবার পুত্র-টুত্রদের থেকে অনেক শাঁসালো। যদিও ছেলের আচার-আচরণ চালচলন এবং বিশ্বনস্যাৎ ভঙ্গী-টঙ্গী তু'চক্ষের বিষ দেখে সত্যশরণ, তবু এই একটা বিষয়ে তার তুর্বলতা আছে। পাঁচজন কেষ্ট-বিষ্টু লোকের ছেলেদের সঙ্গে ঘোরাফেরা করে তার ছেলে, তাদের কাছে যেন ছোট না হয়।

তাছাড়া তাদের বংশে এর আগে বি. এ. পাসই বা করেছে কে! এ ছেলে বি. এ. পাস করেছে, এম. এ. পড়ছে—এর একটা মোহ আছে বৈকি। সত্যশরণের বাবাও ছিল এই ডক্‌বাবু, ছেলেকে গুছিয়ে নিজের অধীনে ঢুকিয়ে দিয়ে যখন ছেলের ভবিষ্যৎ বাঁধিয়ে দিলাম ভেবে নিশ্চিন্ত হয়েছিল, তখন সত্যশরণের ম্যাট্রিক পরীক্ষার মাস আষ্টেক বাকি। বাবা বলেছিল, আর পাসের পড়ার কী দরকার বাবা? চাকরির জন্যেই তো পাস করা, সেটাই যখন হয়ে যাচ্ছে এ সুযোগ ছাড়তে আছে? লেগে পড়ে থাকলে এই চাকরিতেই কোঠা বালাখানা! দেখছ তো আমাকে, আর মামাদেরও দেখছ।

তা দেখাদেখির বুদ্ধি না থাকলেও বাপের কথার অবাধ্য হওয়া যায় এ বুদ্ধি ছিল না সত্যশরণের, তাই সত্যশরণ তদবধিই ডক্‌বাবু।

বাপের কাছে বেশ কিছুদিন তালিম নিতে পেরেছিল সত্যশরণ, ছেলেকে ওই চাকরির মূল রহস্যরসের শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে তবে ইহলোক থেকে বিদায় নিয়েছিল বাবা।

বাপের মতোই হয়েছে সত্যশরণ, দরজার ওই লোহার খিলটা ওর বাপের আমলেরই। তবে একটা বিষয়ে সত্যশরণ একটু অন্যরকম, ছেলেকে সে লেখাপড়া শেখাচ্ছে। সাত-তাড়াতাড়ি চাকরিতে ঢুকিয়ে দেওয়ার কথা স্বপ্নেও ভাবছে না। এবং মুখে যতই কটুকাটব্য করুক, ওই আর একটা বিষয়ে দুর্বলতা আছে। ভাল জামা জুতো পরানো। নিজে চিরদিন খেঁটে ধুতি আর জিনের কোট পরে জীবন কাটিয়ে এল বলেই কি? না অন্য এক কারণ? হয়তো সেটাই কারণ।

অল্প বয়সে মা মরেছে পার্থর। আবার বলতে কি, পার্থ সত্যশরণের বুড়ো বয়সেরই ছেলে। রমলার যখন বারো-তেরো বছর বয়স, দ্বিতীয় কোন সন্তানের আশা যখন ছেড়েই দিয়েছে সত্যশরণ-দম্পতি, যখন সত্যশরণ কোন বিষয়ে কৃপণতা করলে বৌ রেগে রেগে বলতে শুরু করেছে, কিসের জন্যে টাকা-পয়সা তাঙড়াচ্ছ? কে ভোগ করবে? পরের ছেলে জামাই ব্যাটা তো! হঠাৎ পার্থর আবির্ভাব-সূচনা। বলাই বাহুল্য, এ সংবাদে সত্যশরণ আহ্লাদে একটু বেশীই বিচলিত হয়ে গিয়েছিল, ছেলের আটকৌড়েতেই যা খরচ করে বসেছিল, তার গল্প পাড়ার মহিলারা এখনো করেন। সেই আরাধনার ছেলেকে বেশীদিন ভোগ করতে পেল না কমলা, তিন বছরের রেখে মারা গেল। সেই থেকে রমলার ওপরই ওর ভার। পার্থ নামটাও রমলার দেওয়া।

বংশানুক্রমিক হিসেবে সত্যশরণ ছেলের নাম রেখেছিল নিত্যশরণ, কিন্তু রমলাই বলে বসল, ও নাম বড় পুরনো বাবা, একেবারে সেকেলে, ইস্কুলে ভর্তির সময় ও নাম বদলে দিতে হবে।

সত্যশরণ বলল, বলিস কি! অন্নপ্রাশনের নাম আবার পালটানো যায়!

রমলা বলল, কেন যাবে না? আমাদের ইস্কুলের একটা মেয়ের

দাদার নাম ছিল নাকি অভয়, সে বদলে নাম করে নিয়েছে নির্ভয়।

কমলা তখনো বেঁচে, বিছানায় শোওয়া, সে বলল, বড্ডো তো তফাত করল, অভয় আর নির্ভয় একই তো।

একই কি গো মা, মানে তো আকাশ-পাতাল। তাছাড়া শুনতেও অনেক একেলে। খোকার নাম নিত্যর বদলে থাক্ পার্থ।

সত্যশরণ সন্দিগ্ধ গলায় বলেছিল, পার্থশরণ ?

আঃ, ওসব শরণ চরণ আর নেই বাবা এখন, এমনি শুধু পার্থ।

শুধু পার্থ ? সত্যশরণ রেগে বলল, লোকে নাম জিজ্ঞেস করলে বলবে পার্থ ? মনে হবে না যেন ঢিল ছুঁড়ল ?

বাবার যেমন কথা ! হেসেছিল পনেরো বছরের রমলা, তুমি বাবা বড় গাঁইয়া। বেশ, তবে পার্থসারথি। এক-গা গয়না ঝলসে হেসে উঠেছিল সে।

তখনো সংসারে হাসি-আমোদেরই বন্যা। কমলা যে ওর ওই রোগশয্যা থেকে আর উঠবে না, এ কথাও তখন জানা নেই কারুর, এবং সদ্য-বিবাহিতা রমলাও যে আর শ্বশুরবাড়িতে ফিরে যাবে না সেটাও স্বপ্নের গোচরে ছিল না কারুর।

কিন্তু স্বপ্নের অগোচর ব্যাপারটাই ঘটেছিল। সাবেককালের রীতিতে রমলা যখন বিয়ের পর বছরের মেয়াদে বাপের বাড়ি বাস করছে তখন হঠাৎ জরুরী তার এল। ভয়ঙ্কর সেই খবরটা দিয়ে ওপক্ষ জানিয়েছে, শীঘ্র পাঠিয়ে দেওয়া হোক বৌমাকে।

সত্যশরণ কপাল চাপড়ে বুক চাপড়ে বলল, আর কী করতে পাঠাব ? একেবারে শেষ করে তবে খবর দিয়েছে ! কেন, তিনদিন যদি জ্বর ছিল তবে আগে খবর পাঠায়নি কেন ?

কমলাও তো তখন প্রায় মৃতকল্প, রোগে এবং এই নিদারুণ শোকে, তবু সে বোঝাতে চেষ্টা করল, জ্বর হতে না হতেই কি মানুষ বুঝতে পারে এটা মরণজ্বর ? জ্বরের স্বরূপ বুঝতেও তো দুদিন লাগবে !

কিন্তু সত্যশরণ বুঝল না, বলল, না না, আর আমি ওকে ওখানে পাঠাব না। ওর আমি আবার বে দেব। এ আইন হয়েছে এখন।

হ্যাঁ, সাবেকী প্যাটার্নের হলেও এ যুগের আইন দেখিয়েছিল সত্যশরণ, তারপর বিবেককে শুনিয়ে সতেজে বলেছিল, আর ও তো আমার বলতে গেলে কুমারীকন্যাই! সেই যা অষ্টমঙ্গলার ক'দিন শ্বশুরঘর করেছে।

রমলা নীরবে কেঁদেছিল। রমলার মনের মধ্যে আধুনিক আইন সম্পর্কে কোন্ ভাব ছিল, তা বোঝা যায়নি, কারণ কমলা তখন যাবার পথে। একদিকে মৃত্যুমুখী রোগী, আর একদিকে দুরন্ত শিশু, তার মধ্যে থেকে রমলার জীবনের পুনর্বাসনের কথাটা যে বেশীদূর অগ্রসর হল না এটা স্বাভাবিক, এর জন্যে সত্যশরণের দোষ দেওয়া যায় না। ভিতরে ইচ্ছা থাকলেও কি সব সময় বাইরে সেটা প্রকাশ করবার সুযোগ আসে?

যদিও কমলা মরবার আগে বলেছিল, রমলির জন্যে যা করবে বলেছিলে, আমি মরলে তা কোরো। কিন্তু ঠিক মরণকালে আবার এটাও বলেছিল, খোকাকে দেখো। আমার গা ছুঁয়ে দিব্যি কর—সৎমা এনে দিও না ওকে। ও কষ্ট পাবে দেখলে আমি পরলোকেও শান্তি পাব না।

তবে? তবে আর কী করবে সত্যশরণ? কোন্‌টা করবে?

রমলাকে এ সংসারে না রাখলে খোকার কষ্টটা বাঁচাবে কে? অতএব রমলার জীবনে আর পুনর্বাসন হল না। উদ্বাস্তুই থেকে গেল রমলা।

সত্যশরণ ভেবে রাখল, খোকাটা একটুখানি বড় হয়ে উঠলেই রমলার কথা ভাববে। তখনও তো মাত্র সতেরোর মত বয়েস রমলার। দেখতেও প্রায় সুন্দরীই। কমলার মতই দেখতে হয়েছিল কমলার ছেলে-মেয়ে।

পার্থ বলে, শুধু এইটুকুর জন্যেই, বুঝলি দিদি, শুধু এইটুকুর জন্যেই তোদের ভগবানকে একটু মানতে ইচ্ছে করে। নইলে পার্থ ঘোষের চেহারাটি তো ওই ডক্‌বাবুর মতও হতে পারত! সেটারই বেশী চান্স ছিল!

আর নামটার জন্যেও পার্থ কৃতজ্ঞ দিদির কাছে। বলে, উঃ, তুই আমায় একটি পরম সর্বনাশ থেকে বাঁচিয়েছিস দিদি! নইলে মৃত্যুকাল পর্যন্ত ওই নিত্যশরণের বোঝা বয়ে বেড়াতে হত আমাকে!

দিদির সঙ্গে পার্থর বয়সের পার্থক্য আকাশ-পাতাল, তবু তুই করেই কথা বলে। জ্ঞানাবধি ডাকতে শুনেছে শুধু বাবাকে, তুইটাই শুনেছে। তবে ছেলেবেলায় কখনো কখনো ঝি-চাকরের অনুকরণে বলত, দিদিমণি, আপনি।

বাজারের থলি হাতে নিয়ে বলত, দিদিমণি, কী বাজার আসবে বলুন। খেলাঘরের চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বলত, দিদিমণি, আপনার চা।

দিদি বিগলিত হত।

এই ছেলেটাকে ফেলে দিয়ে চলে যাবে রমলা আপন জীবনের পুনর্বাসনের চেষ্টায়, নাকি ফিরে যেতে চাইবে ছেড়ে-আসা গ্রামে?

তা হয় না, তা হয়নি। রমলা এই সংসারের কর্ত্রী হয়ে বসে আছে। এবং বেশ সগৌরবেই প্রতিষ্ঠিত আছে। রমলার কথায় সত্যশরণ পর্যন্ত চলেন, রমলার মুখটা একটু কঠিন দেখলে সত্যশরণ পর্যন্ত ভয় পান। সংসারের কোন ব্যবস্থাপনায় রমলার রায়ই শেষ রায়, রমলার কথাই শেষ কথা।

তবে পার্থ নামের ফাজিল ছেলেটার কথা আলাদা। ও দিদিকে চটিয়ে দিয়ে মজা দেখে। অবাধ্যতা করে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে আবার আদর কাড়িয়ে গলায়। ওকে নিয়েই রমলার যত জ্বালা। ওকে নিয়েই রমলার যত সুখ।

ওর জন্যে বাবার কাছ থেকে যত কিছু আদায় করে দেওয়া রমলার ডিউটি, ওকে বাবার চোখ থেকে আড়াল করে রাখার চেষ্টাটি রমলার সাধনা।

বলাই বাহুল্য, আধুনিক ছেলের আচরণ-চলন-বলন, কোনটাই সত্যশরণের পছন্দ নয়। আর ছেলেকে জিনিসপত্র দেওয়ার ব্যাপারে সত্যশরণ কিঞ্চিৎ উদার হলেও স্বাধীনতা দেওয়ার ব্যাপারে

আদৌ নয়। পার্থর জন্যে সেইটি আদায় করে নেওয়াই রমলার কাজ। এবং পার্থর সেই শৈশবকাল থেকেই।

সত্যশরণ মেয়ের কৌশলে এবং জোরে যতটা না দেবার ততটা দিয়ে ফেলে, এবং পরে রেগে রেগে বলে, তুই-ই ওর পরকাল ঝরঝরে করবি।

রমলাও ছেড়ে কথা কইবার মেয়ে নয়, সঙ্গে সঙ্গে বলে, বেশ, তবে কালই আমায় রাণাঘাটে পাঠিয়ে দাও। তোমার অন্ন ধ্বংসাব আবার তোমার ছেলের পরকাল ধ্বংস করব এটা তো কোন কাজের কথা নয়।

বলা বাহুল্য, এটাই হচ্ছে জোঁকের মুখে নুন। এই রকম বেগতিক দেখলেই সত্যশরণ বাড়ি থেকে সরে পড়ে। আর অনেকক্ষণ পরে ফিরে হয়তো তেষ্টা পাওয়ার ঘটনার আতিশয্য দেখিয়ে, নয়তো বা রাস্তার কোন একটা ঘটনাকে (সেটা কাল্পনিকও হতে পারে) কেন্দ্র করে জমজমাট একটা গল্প ফেঁদে সেই গত কথাটা ভুলিয়ে দেয় মেয়েকে।

এই ভাবেই আস্তে আস্তে কখন রমলা তিন বছরের ভাইটাকে একুশ বছরের করে তুলেছে। আর নিজেকে ষোলো থেকে তেত্রিশে নিয়ে গিয়ে তুলেছে। কিন্তু ওই দীর্ঘ সময়টা রমলাকে মারতে মারতে তো দূরের কথা, যেন না ছুঁয়েই চলে গেছে। রমলা এখনো পুরনো পদ্ধতিতে বাবার চোখ থেকে আগলে বেড়াচ্ছে 'খোকা'কে, আর প্রকৃতির ঝড়বৃষ্টির ধাক্কা থেকে সামলাচ্ছে।

ছেলেবেলায় যতদিন দিদির কাছে শুতো পার্থ, রাত্রে ভাল করে ঘুমোতেই পারত না রমলা। হঠাৎ-হঠাৎই মনে হত তার পার্থর নিশ্বাসটা যেন কেমন কেমন লাগছে, ঘাড়টা যেন গুঁজে গেছে, বোধ হয় শীত করছে ওর, বোধ হয় গরম হচ্ছে ওর। অঘোরে ঘুমোলে হঠাৎ ভয়ে কাঁটা দেওয়া গায়ে ভাবত, ঘুমটা ভাঙবে তো! মাঝে মাঝে হয়তো সেই গভীর ঘুম থেকে ঠেলে জাগিয়ে তুলে বলত, জল খাবি পার্থ ?

হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষার আগের সময় থেকে রাত জেগে পড়ার অজুহাতে পার্থ আলাদা ঘরে শুতে আরম্ভ করল। ঘরের অভাব নেই বাড়িতে, দোতলাতেই চারখানা ঘর, তাছাড়া তিনতলায় একখানা বড় ঘর, বারান্দা।

সত্যশরণের বাবা ওই ফ্ল্যাটটি নিজের জন্যে তৈরি করিয়েছিল, একটু নিরিবিলিতে থাকবে বলে, কারণ সন্ধ্যের দিকে একটু বিশেষ নিরিবিলির দরকার হত তার। ছেলেটা বড় হচ্ছিল, গিন্নীর শ্যেন-দৃষ্টি ছিল, আর শ্বশুরঘর থেকে 'আসুন্তি যাওন্তি' গোটাচারেক মেয়ে ছিল লোকটার। মেয়েরা আসা মানেই নাতি-নাতনী আসা। ওই সব চোখ থেকে আত্মরক্ষা করতেই ওই ঘর তৈরি করা।

কিন্তু সবই পড়ে আছে। ছেলে একাই ভোগ করছে। সত্যশরণ সহজে দিদিদের পাত্তা দেয় না। তাতে ঝামেলা ঢের, তাছাড়া লোকটার ধারণা বধূজীবনে কমলা ওই একগণ্ডা ননদের শাসনে শাসনেই চিররুগ্ন হয়ে গিয়েছিল।

সে যাই হোক, মোটের ওপর এ বাড়িতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঘর, কাজেই পার্থর পক্ষে একটা ঘর শোবার এবং আর একটা ঘর পড়বার করে নিতে অসুবিধে হয়নি কারুর।

তবে রমলার? সে অসুবিধে তো মুখ ফুটে বলার নয়। পার্থর রাত জেগে পড়ার ঘটনা যে রমলাকেও প্রায় সারারাত জাগিয়ে রাখে, সে কথা পার্থর গোচরে এলেও তো রক্ষে থাকবে না। রসাতল করে ছাড়বে সে। অতএব চুপি চুপি এসে জানালা থেকে উঁকি মেরে তদারক করে যেতে হত রমলাকে, ছেলেটা পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়ল কিনা, বেশী রাত জাগছে কিনা, এটা ওটা।

পরীক্ষা চুকলেও এবং পার্থ নামে তার সেই আঁচল-চাপা ছেলেটি কলেজ-বয় হয়ে উঠলেও ওই অভ্যাসটি যায়নি রমলার। পার্থ ঘুমিয়ে পড়লে চুপি চুপি একবার দেখে যাওয়া—সব ঠিকঠাক আছে কিনা।

বলতে কি ঠিকঠাক থাকে না কোনদিনই। হয় দেখবে বুকের ওপর বই রেখে চশমা চোখে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, নয়তো ফুল ফোর্সে

পাখা খুলে তদুপরি মাথার জানালা-টানালা খুলে রেখেছে, নয় মশারি ফেলেনি, নয়তো বা খাবার জলের জগটার ঢাকা খোলা, নয়তো ঘরের দুটো আলোই কট্‌কট্‌ করে জ্বলছে।

রমলা পার্থর ঘরের জন্যে বেডসুইচের কথা বলেছিল বাবাকে। বাবা বলেছিল, আর কত কুড়ের বাদশা করে তুলবি ছোঁড়াকে? শুয়ে শুয়ে আলো নেভাতে হবে? এরপরে যে 'পিপু ফিশু' হবে রে!

অতএব ওটা হয়নি এখনো। অবশ্য হলেও তো রমলার কাজ কমত না, বাকিগুলোর জন্যে তো কোন সুইচ আবিষ্কার করা যেত না।

এই যে এখন বেশী রাত্রে হঠাৎ বৃষ্টি এল ঝমঝমিয়ে, রমলা কি নিজের ঘর থেকে কোন সুইচ টিপে পার্থর মাথার জানালা বন্ধ করতে পারত? তা তো নয়!

রমলাকে তাই দুদ্দাড়িয়ে চলেই আসতে হল। অবশ্য এ-ঘরে ঢুকবার সময় যাকে বলে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে।

এসে দেখে যা ভেবেছে তাই। হু-হু করে জোলো বাতাস বইছে ঘরের মধ্যে এবং ফুল ফোর্সে পাখা খোলা। নেহাৎ বৃষ্টির ছাটটা উল্টোমুখো, তাই জলে ভেসে যায়নি বিছানা। তা গেলেও হয়তো ঘুম ভাঙত না ছেলের। দেখছে তো আজন্মকাল—ঘুমকাতুরের রাজা!

তবু হঠাৎ পাখা এবং জানালা দুই বন্ধ করলে পাছে ঘুমটা ভেঙে যায়, তাই রমলা জানালাটার দিকেই এগিয়ে গেল। আর ঠিক সেই সময় অন্ধকারের মধ্যে থেকে একটা বিরক্ত কণ্ঠ ঝলসে উঠল, আঃ দিদি! কী হচ্ছে কি!

এই অগ্নিস্ফুলিঙ্গের জন্যে অবশ্যই প্রস্তুত ছিল না রমলা, তাই চমকে গেল, থতমত খেল। তা বলে সেটা প্রকাশ করবার পাত্রী তো সে নয়। তাই নির্লিপ্ত গলায় বলল, হবে আবার কী! ঘরে বৃষ্টির ছাট আসছে দেখছিস না?

বাজে বকিস না, পার্থ বেশ চড়া গলায় বলে, মোটেই ছাট আসছে না।

ছাট না আসুক, জোলো হাওয়া তো আসছে, বলল রমলা জেদ বজায়ের সুরে ।

পার্থ বিছানায় উঠে বসল, আরো চড়া গলায় বলল, যদিই আসে, এ-ঘরে একটা দুগ্ধপোষ্য শিশু আছে ?

রমলা একটু অবাক হল বৈকি । এতটা চড়া গলা অপ্রত্যাশিতই । এরকম ক্ষেত্রে রাগ পার্থ করে না তা নয়, খুবই করে, তবে ঠিক এ সুরে নয় । হয়তো বলে, উঃ, আরাম করে একটু হাওয়া খাবারও উপায় নেই !

নয়তো রমলা এসে আস্তে আস্তে পাখাটা কমিয়ে দিলে, বিনা বাক্যব্যয়ে উঠে আবার রেগুলেটারটা শেষপ্রান্তে ঠেলে দেয় । নয়তো বলে, ঠিক আছে, কাল থেকে ডক্‌বাবুর মত ঘরে খিল লাগিয়ে শোব, দেখি তুই কী করিস !

জেগে উঠলেই অবশ্য মাঝে মাঝে এসব ঘটে । নচেৎ বেশীর ভাগ দিনই চুপি চুপি চলে আসে রমলা ।

পরদিন পার্থ মেজাজ দেখায়, সেই তুই পাখা বন্ধ করে দিয়ে গিয়েছিলি ? উঃ, মশারিটা ফেলে দিয়ে গেলি কখন ? তোর সর্দারীর জ্বালায় জীবন মহানিশা হয়ে গেল ! কখন কী করে যাস, হঠাৎ দেখি দমবন্ধ হয়ে আসছে !

রমলাও মেজাজ দেখায়, একেবারে দমবন্ধ ! আর কিছু নয় ? বলি বারো মাস যে টন্‌সিল নিয়ে ভুগিস সে খেয়াল আছে ? হ্যাঁ, হত তেমন ডাকাবুকো শরীর, অহঙ্কার মানাত !

পার্থও চোটপাট করে, ডাকাবুকো শরীর আর হবে কোথা থেকে ! হতভাগার অজ্ঞানতার সুযোগে আতুপুতু করে করে শরীরটির তো বারোটা বাজিয়ে দিয়েছ বাবা ! অত ননীর পুত্‌লী করে রাখলে আর হবে না টন্‌সিল !

কিন্তু এ সমস্তই তো হালকা সুরের । যেন খেলাচ্ছলে কোঁদল । আজই হঠাৎ সুরটা বেসুরো লাগল । রমলা গম্ভীর হয়ে গেল ।

তবু রমলা নিজের মানটা বজায় রাখতে বলল, নেই বুঝি ! আমার

তো মনে হয় আছে। আর দুগ্ধপোষ্য যদি না হয় তবে তো এখন থেকে মত বদলাতে হয়, তোমাকে একজন সাবালক মানুষ ভাবতে হয়।

হ্যাঁ, তাই ভাববে, বলে পার্থ হঠাৎ বিছানা থেকে নেমে সদ্য বন্ধ-করা জানালাটা আবার দু'হাট করে খুলে দিয়ে ফিরে এসে শুয়ে পড়ে বলল, সব সময় তোমার এই পাহারা দিয়ে বেড়ানো ছাড়তে হবে—অসহ্য !

ঘরে হঠাৎই আবার জোরালো জোলো হাওয়া যেন সবলে প্রবেশ করল। রমলার মনে হল কে বুঝি তাকে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে দিল। ওই ধাক্কাতে যে ঘর থেকে চলেই যাওয়া উচিত, ঠিক এই মুহূর্তে সেটাও মনে পড়ল না রমলার, কয়েক সেকেণ্ড বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে রইল ওই আবছা বিছানাটার দিকে। তারপর চলে এল আস্তে আস্তে।

হু-হু করে বাতাস বইছে বারান্দাতেও, তার সঙ্গে জোর জলের ছাট, দ্রুত বারান্দাটা পার হয়ে নিজের ঘরে গিয়ে যখন ঢুকল রমলা, তখন হু-হু করে জল বইছে তার চোখ দিয়েও। ঠাণ্ডা জল নয়, প্রায় ফুটন্ত।

শৈশবাবধিই তো পার্থ দিদিকে যথেচ্ছ বলে। রমলা তো চিরদিনই প্রশ্রয় দিয়ে এসেছে। পার্থর কথায় মনে দুঃখু ! এ তো মনেই আনতে পারা যায় না। অথচ আজ হল দুঃখ। জ্বালাভরা দুঃখ। একটা অবিশ্বাস্য বিস্ময় বেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধ করে রাখল। তারপর মনে পড়ল, এ-ঘরে জল ঢুকছে, পায়ের তলায় জল গড়িয়ে মেঝে ভেসে যাচ্ছে, পা ভিজে গেল।

বেশ হয়েছে, ঠিক হয়েছে, নিজেকেই নিজে ধিক্কার দিল রমলা, যেমন ধাষ্টামো! নিজের ঘরে ঝড় বইছে তুমি ছুটলে অন্যের ঘর সামলাতে—হল তো ? এই অপমানটি তোমার পাওনা ছিল।

তোষকটা উলটে ফেলে দিয়ে শুধু গদির ওপর শুয়ে পড়ল রমলা বিনা বালিশে। বলা বাহুল্য, ঘুম এল না। আসবার কথাও নয়

অবস্থা। এত উত্তেজিত মাথায় কবে কার ঘুম আসে ?

রমলা চুপ করে শুয়ে ভাবতে লাগল, কিন্তু কারণটা কি ? হঠাৎ পার্থ এমন অসভ্যতা করল কেন ? আচ্ছা, কিন্তু এমনই বা কী করেছে ? তাও ভাবতে চেষ্টা করল রমলা। এরকম তো করেই ও। বন্ধ জানালা ফের খুলে দেওয়া, কমানো পাখা পুনর্বার পূর্ণতেজে ঘুরিয়ে দেওয়া, কট্‌কট্‌ করে কথা বলা—এসব তো কিছুই নতুন নয় পার্থর ?

কই, কোনদিনই তো এমন অপমান মনে হয় না। রমলাও তার পি[illegible] জোর জোর বকুনি লাগিয়ে চুপ করিয়ে দেয় তাকে। তবে ? আজই বা এমন হচ্ছে কেন ? সত্যিই কি ওর গলার সুরে খুব ভয়ানক কিছু ছিল ? কিংবা রমলার মনের ভ্রম ? আচমকা ঘুম ভাঙার জন্যে হয়তো ও-রকম লাগলো। চেষ্টা করল এই সব ভাবতে, কিন্তু শান্তি এলো না।

তারপর ভাবতে ভাবতে শেষ সিদ্ধান্তে এল, কিছু না, সেই নয়নার ব্যাপার। তাই পার্থ বলেছে পাহারা দেওয়া চলবে না—অসহ্য !

তা হয়তো নয়নার ব্যাপারে একটু পাহারা দেওয়ার মতই হয়। রমলা নিজেই বোঝে। তবে অবিশ্যি আর কেউ বুঝতে পারে তা ভাবেনি।

কিন্তু পাহারা না দিয়ে করবে কী ? ওই গায়ে-পড়া আহ্লাদী মেয়েটাকে পার্থর সঙ্গে অবাধে গল্প করতে দেবে নাকি ? তা রমলা তো তাকে বকেও না, কিছু বলেও না, আসতেও বারণ করে না, শুধু সে বেড়াতে এসে যতক্ষণ থাকে, নিজের কাজকর্ম ফেলে রমলাই তার সঙ্গে গল্প করে।

নয়না নামের ওই মেয়েটা 'গল্পে' আছে খুব, রমলার সঙ্গেও দিব্যি জমাতে পারে, তবু ভিতরে ভিতরে যে একটু উসখুস করে, সেটি তো রমলার চোখ এড়ায় না। হয়তো কথার মাঝখানে দুম করে বলে বসে, এই যা, পার্থদার কাছ থেকে যে দুখানা বই নেবার কথা ছিল ! বলেছিল এনে দেবে, দেখি বাবু দয়া করে এনেছেন কিনা !

রমলাও সঙ্গে সঙ্গে বলে, কী বই রে ?

ওই যে দুখানা পত্রিকা !

ও মা, শুধু পত্রিকা ? নাম নেই তার ?

নয়নাও কম চতুর নয়, বলে ওঠে, নাম কি আমিই জানি ছাই, বলেছিল মাসিমা বই বই করেন, দু-একটা ম্যাগাজিন এনে দেব ।

চালাকিটা বুঝতে পারে রমলা । মা চেয়েছিলেন এমন কথা বলে না । কে জানে, তাহলে ধরা পড়ে যাবে কি না । মাসিমা বই বই করেন, তাই—

অবশ্য বই বই তিনি করেন না তা নয়, করেন, এবং ষোলো-সতেরো বছরের মেয়েটাকে যে অম্লান চিত্তে সাধের পার্থদার বাড়ি যাবার অনুমতি দেন সেটাও ওই বইয়ের স্বার্থেই। মেয়েটি যে তার মধ্যে থেকে নিজের স্বার্থ দেখে তা ঠিকই বোঝেন, কিন্তু লোভ বড় জিনিস । মেয়েকে আটকালে পার্থ যে এমন অবিরত বই সাপ্লাই করবে না এটা তো ধ্রুব সত্য ।

যদিও বলতে গেলে ব্যাপারটা কিছুই নয়, ও নিয়ে দুশ্চিন্তা করাটা হাস্যকরই, পাড়ার মেয়ে বরাবরই আসে, আর মাত্র তো একটা স্কুলের মেয়ে, তার আবার অনিষ্ট করবার ক্ষমতা কতটুকু ? তবু হঠাৎ হঠাৎ মনে এসে যায়, ওর থেকে কম বয়সে রমলার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল, আর সব শেষ-টেষও হয়ে গিয়েছিল ।

ওইটা মনে আসার পর আর নয়না নামের মেয়েটাকে ছেলেমানুষ বলে উড়িয়ে দিতে পারা যায় না । তবে পার্থ সম্পর্কে অভিমতটা এযাবৎ স্পষ্টই ছিল, দেখতেই লম্বা হয়েছে, আসলে একটা বাচ্চা মাত্র । আজই এখন মনে হচ্ছে, হয়তো যেমন ছিল তেমন আর নেই । হয়ত অন্যরকম হয়ে গেছে, আর ছেলেমানুষ ভাবা যাবে না ।

ছেলে-মেয়ে বড় হয়ে উঠলে যে আর ছোট থাকে না, এই বোধটা থাকে না বলেই মায়েদের একবার করে ভয়ানক একটা আঘাতের মুখোমুখি হতে হয় । রমলাকে মা না হয়েও সেই আঘাত সইতে হল ।

রমলার এ আঘাত নিজের ডেকে আনা । আর ওই ডেকে

আনার কারণটা হচ্ছে, পার্থর বড় হয়ে ওঠার মধ্যে রমলার মস্ত একটা লোকসান নিহিত রয়েছে। পার্থ বড় হয়ে গেলে রমলার কী থাকবে? রমলা তাই উটপাখির মতো বালিতে মুখ গুঁজে সূর্যকে অস্বীকার করতে চাইছে। কিন্তু বালিটাও যে তেতে ওঠে।

তারপর রমলা ভাবতে চেষ্টা করল, আজকালের মধ্যে তার আর নয়নার ভিতরে কী ধরনের বাক্য বিনিময় হয়েছে।

আজ কি এসেছিল নয়না? না, আজ নয়, গতকাল। কালই তো এসেই প্রথমে বলে উঠেছিল বাচাল মেয়েটা, রমলাদি, পার্থদার কাছ থেকে একটা ইনস্ট্রুমেণ্ট বক্স নেবার আছে, আগে নিয়ে আসি। নইলে পরে গল্পের স্রোতে একেবারে ভুলে যাব।

রমলা সরল সত্যের গলায় বলেছিল, ওমা, পার্থ যে এইমাত্র বেরিয়ে গেল!

তার মানে রমলা পুকুরচুরি করল। অথবা তার থেকেও বেশী।

জলজ্যান্ত আস্ত একটা মানুষ পুকুরের থেকে অনেক বড়ই। তাছাড়া পুকুরটা নিজে ছুটে এসে চুরিটা ধরিয়ে দিতে পারে না, মানুষে পারে। তখনি সেই দণ্ডে পার্থ চটি ফটফটিয়ে এসে দাঁড়াতে পারে, আর বলে উঠতে পারে, কি রে নয়না, কতক্ষণ?

বলবেই। কতক্ষণ দোতলায় বসে থাকবে পার্থ নামের ছেলেটা, একতলায় দিদিকে এবং প্রতিবেশিনী কন্যাকে সরবে গল্প করতে দিয়ে?

তা সে রিস্ক নিয়েই বলেছিল রমলা। তেমন ঘটলে রমলা বলে উঠবে, ওমা, তুই বাড়িতে রয়েছিস? আর আমি কিনা নয়নাকে বলছি—

রমলার ধারণা এইভাবে অন্যের বুদ্ধির গোড়ায় বাঁধ দেওয়া যায়। সে-বুদ্ধি আর এদিকে বেশীদূর পর্যন্ত এগোতে পারে না।

কিন্তু কাল রমলাকে বোকা বানিয়ে মেয়েটা বলে বসল, ঠিক আছে, দরকার তো আর আমার ওকে নয়, ওর বাক্সটাকে, গিয়ে নিয়ে নিচ্ছি।

ও মা শোন কথা, তুই আবার ওর ঘরের কোথায় কী খুঁজে পাবি?

বলেছিল রমলা এই রকম বোকার মতো। যার উপর নাকি সন্দেহ, যে পার্থর প্রাণের ঘরটির সন্ধানে ফিরছে, তাকে কিনা ওই কথা!

উচিত উত্তরই দিয়ে বসল সে। বলল, হুঁ, খুঁজে পাব না! ও ঘরের নাড়িনক্ষত্র কোন্‌টা আমার অজানা? গেলেই পেয়ে যাব।

আরে বাবা, বোস্ না। যাবার সময়ই না হয় নিস, তখন পার্থ এসে পড়তে পারে। সমুদ্রে বালির বাঁধ দিল রমলা। মানে অন্তত তখনটা রক্ষে হবে।

কিন্তু রক্ষে হল না। পাজী মেয়েটা সেই উঠে গেল ওপরে। আর পরক্ষণেই পার্থর পুরনো একটা ইনস্ট্রুমেণ্ট বক্স হাতে নিয়ে নেমে এসে বলল, পার্থদা ঘরেই ছিল, আমার জন্যে বার করেই রেখেছিল এটা।

এরপর আর গল্প জমেনি। নয়নার ভীষণ পড়া ছিল—'যাচ্ছি রমলাদি' বলে চলে গিয়েছিল।

আজ আর আসেনি। কিন্তু আজ যে আসেনি সেটা রমলার সারাদিনে মনেও পড়েনি, কারণ রমলার মনে অপরাধ বোধ-টোধ ছিল না, এখন মনে পড়ল। তাহলে ওই জন্যেই আসেনি? রাগ দেখানো হল, অথচ দেখাসাক্ষাৎটি ঠিকই হল। ইনিই গেলেন। না গেলে জানল কখন যে রমলা এত বড় পাহারাওয়ালা! কাল তো আধ মিনিটেই নীচে নেমে এসেছিল।

রমলা ভাবল, মেয়েটাকেই বাচাল বেহায়া গায়ে পড়া ভাবতাম, এখন দেখছি টানটি দু'পক্ষেই। ঠিক আছে, কর্ তোরা যা খুশি। আমি আর পাহারা-টাহারা দিচ্ছি না। তারপর বুঝো প্রেম করার ঠ্যালা! ডক্‌বাবু তোমাদের প্রেম করা ডকে তুলবে, তখন বুঝতে পারবে দিদি কেন পাহারা দেবার চেষ্টা করত। নয়না আমাদের স্বজাতি? তাই তুই ওর সঙ্গে ভাব-ভালবাসাবাসির সাহস করছিস? বাবাকে চিনিস না তুই?

আমি কাল থেকে উদাসীন থাকব, স্থির সঙ্কল্প করল রমলা। আর ঠিক করল, আর আমি হালকা হব না, পার্থ বড় হয়েছে মনে রাখব, আর সেই সঙ্গে এও মনে রাখব আমি ওর থেকে তেরো বছরের বড়—দিদি।

আমারই দোষ, ভেবেই চলে রমলা, আমি ওর কাছে বড়র মত হতে পারিনি, অন্ধ স্নেহের কাছে নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছি, ছোট থেকে ওর সব ঔদ্ধত্য, সব বাঁদরামি, বাবার চোখ থেকে সামলেছি। আর নিজে 'অমৃতং বালভাষিতম্' ভেবে মুগ্ধ হয়েছি। ও তার সুযোগ নিয়েছে। আমাকে যে মানতে হয় শেখেনি। আমার সম্পর্কে সমীহ করতে ভুলে যাচ্ছে। ঠিক আছে, যা হয়ে গেছে হয়েছে, কাল থেকে গম্ভীর হয়ে থাকব।

এই পর্যন্ত ভেবে রমলা যেন কতকটা হালকা হল, ভয়ানক যে জ্বালাটা তাকে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলছিল তার থেকে যেন রেহাই পেল।

তারপর রাত্রি যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, বৃষ্টি থেমে গেছে দেখে জানলাটা খুলে দিল রমলা, অবাক হয়ে দেখল কখন আবার জ্যোৎস্নাও ফুটেছে। রাস্তায় নদীর মতো জলস্রোত, তার উপরে চাঁদের ছায়া। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল। যেন জীবনে কখনো এমন দৃশ্য দেখেনি।

তাকিয়ে দেখতে দেখতে একদিনের জন্যেও যে কথা ভাবেনি রমলা হঠাৎ তাই ভেবে বসল। ভালবাসা জিনিসটা যে কী, জীবনে জানলাম না। অথচ বয়েসকালে কোনদিন একবার মনেও পড়েনি।

পৃথিবীর হিসেবে যে রমলার বয়েসকাল একেবারে শেষ হয়ে যায়নি, সেকথা ভাবল না রমলা, হয়তো জানেও না। চিরদিন নিজেকে কর্ত্রী ভেবে এসেছে, বড় ভেবে এসেছে, বয়েসকালটাকে অনুভব করেনি।

আজ হঠাৎ মনে পড়ল। হঠাৎ মনে করতে চেষ্টা করল, আচ্ছা, এই এতখানি সময়টা আমি করেছিই বা কী? বৈধব্যের বেদনা নিয়েও

তো হা-হুতাশ করিনি কখনো ! আমি যে বিধবা সেই কথাটাও তো মনে পড়েনি ! তবে সময়টা গেল কোনখান দিয়ে ? কী নিয়ে ? পার্থকে ছাড়া আর যা দেখতে পেল সেটা হচ্ছে, বাবা, সংসারের জিনিসপত্র, রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর, চাকরবাকর, বড়ি, আচার, রেশন, মাসকাবারি ।

এতদিন পরে নিজেকে ভারী দীন হীন মনে হল রমলার । আর বিদ্যুৎ-ঝলকের মতো সহসা মনে হল, এই জন্যেই বোধ হয় ওরা রমলাকে তুচ্ছ করছে । পার্থ আর নয়না নামের ওই সদ্য-বয়েস-হওয়া মেয়েটা ।

আচ্ছা, রমলার না শ্বশুরবাড়ি বলে একটা জায়গা ছিল ? সে-কথাই বা কোনদিন মনে পড়েনি কেন রমলার ? রমলার বাবা রমলাকে আর একটা নতুন শ্বশুরবাড়ি দেবার আশ্বাস দিয়েই কি সেটাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল ? তারপর বাবা তার দেওয়া আশ্বাসটা ভুলে গেল, রমলাও সব কিছু ভুলে গেল । পড়ে গেল পূর্ণচ্ছেদ । কিন্তু রমলার জীবনে পূর্ণচ্ছেদ পড়তে তো এখনও অনেক যুগ ।

প্রায় ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়ল রমলা । তারপর সকালবেলা উঠে দেখে রোদে পৃথিবী ভাসছে । ধড়মড় করে উঠে বসল রমলা । কী কাণ্ড ! এত বেলা হয়ে গেছে !

এখন কী করে কী হবে ! ভোর থেকেই তো ডিউটি রমলার । কারণ সংসার নামক মেসিনটাকে প্রথম চালু করার দায়িত্ব রমলারই । কে তাকে এ দায়িত্ব দিয়েছে ? কে আর, তার নিজেরই স্বভাব । দায়িত্ব তো কেউ কাউকে দিতে পারে না । ওটা দেবার বস্তু নয়, নেবার বস্তু ।

প্রতিদিন ভোর পাঁচটায় উঠে পড়ে রমলা । তার দিনের প্রথম কাজ হচ্ছে রাত্রে সারা বাড়িতে যে তালাগুলো লাগানো হয়েছিল সেগুলো খোলা । গোটা সাতেক তালা দৈনিক খাটে সত্যশরণের বাড়িতে ।

এটা সত্যশরণের বাতিক । বাড়িতে যতগুলো বহির্মুখী দরজা আছে, রাত্রে তার সবগুলোতে 'নবতাল' লাগিয়ে তবে শুতে যেতে হয় ।

রমলাকেই করতে হয়, কারণ চাকর-বাকরকে তো আর ওই বস্তুটি দিয়ে বিশ্বাস নেই। তালা খোলা দিয়ে দিনের শুরু রমলার, তালা বন্ধ করা দিয়ে রাতের।

দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে, নীলকণ্ঠকে ঘুম ভাঙিয়ে গোয়ালাবাড়ি পাঠানো। বেলা হলেই গোয়ালা অম্লান মুখে জানিয়ে দেয়, গাই দোয়া হয়ে গেছে। তার মানে জল মেশানোটিও হয়ে গেছে।

হরিণঘাটার দুধ আসে, সেটা গেরস্তর। যথা রমলার আর পার্থর চায়ের, সত্যশরণের ছানার। গোয়ালাবাড়ির দুধটি সত্যশরণের শুধু চুমুক দিয়ে খাবার জন্যে। ও দুধটুকুর নড়চড় হলে রক্ষে রাখে না রমলা। বাবার জন্যে এই ব্যবস্থাটি রমলারই। তাই নীলকণ্ঠকে ওঠানোও রমলার ডিউটির অঙ্গ।

তৃতীয় কাজ হচ্ছে, বাবার প্রাতরাশটি ঠিক করে রাখা। সত্যশরণ তো আর এদের মত সকালবেলা চায়ের কাপে চুমুক দেয় না, কাজেই টোস্ট, মাখন, ডিম, বিস্কুটের চাহিদা সত্যশরণের নেই। সত্যশরণ সকালবেলা দুধমুড়ি আর পাকা বেল খায়। তার সঙ্গে ঘরে কাটানো ছানা, ভিজে ছোলা আর আদা।

সকালে উঠে ঘরের মধ্যে খানিকক্ষণ কী যে করে সত্যশরণ তা কেউ জানে না। এদিকের কোনখানে এমন একটি ফুটোও নেই যে দেখা যাবে ব্যাপারটা কী। কিন্তু উঠে মুখ হাত ধুয়ে এসে আবার দরজাটা সে বন্ধ করেই খানিকক্ষণের জন্যে। বলে না কাউকে।

রমলা বলে, পুজো-আহ্নিক করে বোধহয়।

পার্থ বলে, ক্ষেপেছিস ? সকালের আলোয় সিন্দুকের টাকাগুলো একবার মিলিয়ে দেখে ঠিক আছে কিনা, রাতারাতি হাওয়া হয়ে গেল কিনা।

নীলকণ্ঠ বলে, বাবু ডনবৈঠক করে।

তা সে যা-ই করুক, ঘর থেকে বেরিয়েই সত্যশরণ বড় জামবাটিতে দুধমুড়ি মাখে। তার সঙ্গে আম কলাও থাকে প্রায়ই। আর রেকাবিতে থাকে ছানা আদা ছোলা, পাকা বেলের শাঁস।

এ সময় সত্যশরণকে বেশ হৃষ্ট দেখায়।

বাবার ভোজনপর্ব হয়ে গেলে রমলা কুটনো কুটতে বসে। এর মাঝখানে পার্থ এসে হাজির হয়। তখন রমলা সব ফেলে তার পিছনেই ছুটোছুটি করে। পার্থর নিত্যনতুন বায়না। আজ যা খুব ভালবেসে খায়, কাল সেটা পাতে পাড়ে না। অতএব আগে থেকে কিছুই ঠিক করে রাখা যায় না।

তবু এতেই তো আহ্লাদ। এতেই তো কাজের রস। ওই যে সত্যশরণ প্রতিদিন একই বস্তু নিয়ে খেতে বসেন, ও খাবার গোছানোয় কোন আহ্লাদ আছে? ওতে জিজ্ঞেস করবার আছে—কেমন হয়েছে? না কি বলবারই আছে, ফার্স্ট ক্লাস হয়েছে তো! সে-সব যা কিছু পার্থকে নিয়ে।

পার্থর ব্রেক্‌ফাস্ট সারা হলেই রমলা গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে রান্নাঘরে। সেখানেও তো পার্থর জন্যে নিত্য নতুন ব্যবস্থা চাই।

তারপর চলল কাজের চাকা সূর্যপথের পথ ধরে। সূর্য আপন পথ পরিক্রমা শেষ করে বিশ্রাম নিলেও সংসার-রথচক্র তার ঘর্ঘর রব থামায় আরো অনেক পরে। রাত বারোটায় দরজায় তালা পড়ে, রথের চাকা থামে।

রমলা ধড়মড় করে উঠে বেরিয়ে এল ঘর থেকে, কোথাও কাজের শব্দটব্দ পেল না। বাবার ঘরের দরজার দিকে তাকিয়ে দেখল যথারীতি ভিতর থেকে বন্ধ। তার মানে বাবা তার সেই পূজো অথবা ডনবৈঠক অথবা টাকা গোনার কাজটা করছে। কিন্তু নীলকণ্ঠ?

তরতরিয়ে নেমে গিয়ে দেখে সিঁড়ির তলায় নীলকণ্ঠ সুখশয্যায় শায়িত। রাগে হাড় জ্বলে গেল। চেঁচিয়ে ডাকল। নীলকণ্ঠ উঠে বসল। তার মানে জেগেই শুয়ে ছিল এই ডাকাটির অপেক্ষায়।

গত রাত্রে সঙ্কল্প করেছিল রমলা এবার থেকে সংসারের ব্যাপারে যতটা সম্ভব নির্লিপ্ত থাকবে, কাউকেই আর বকাবকি করবে না। এত কী দরকার তার? কিন্তু এই প্রখর দিনের আলোয় বৃষ্টির রাতের সঙ্কল্প কোথায় উবে গেল। রমলার অভ্যস্ত তীক্ষ্ণ কণ্ঠ বেজে

উঠল, এখনো শুয়ে পড়ে আছিস যে ?

নীলকণ্ঠ সরল প্রশ্ন করল, কখন ডেকেছিলেন ?

ও, ডাকিনি বলে ওঠনি ? সারাদিন না ডাকলে সারাদিনেও উঠবে না তুমি ? এই এতটা বেলা, দুধের তো বারোটা বেজে গেল। দিদিমণি যদি রাত্তিরের মধ্যে মরে পড়ে থাকে তুইও আর উঠবি না !

নীলকণ্ঠ একগাল হেসে বলে, তেমন হলে কি আর বাবুই দুধ খাবে গো ?

বলা বাহুল্য, এরপর রমলার বকুনির তোড়ে বোঁ বোঁ করে বিছানা গুটিয়ে সরে পড়ে নীলকণ্ঠ। রমলা বকতেই থাকে, আশ্চর্য ! একদিন যদি আমি না-ই উঠি, সংসার আর নড়বে না ? যেখানে পড়ে ছিল সেখানেই পড়ে থাকবে ? কে জানে বিন্দুর মা এসে ফিরে গেল কি না। আসে তো এতক্ষণে।

রাগ করতে থাকে বিলক্ষণ, চারিদিকের ছড়ানো কাজ দেখে রাগে হাড় জ্বলে যায় ঠিকই, তবু কোথায় যেন একটু পুলকের স্বাদ কোমল বাহু দিয়ে জড়িয়ে থাকে। রমলা না নাড়ালে সংসারের চাকাটা এক ইঞ্চিও নড়ে না, এটার মধ্যে যেন একটা পরিতৃপ্তির অনুভূতি আছে।

সত্যশরণ ঘর থেকে বেরিয়ে এল। যথারীতি চটিটা পায়ে দিল, মিনিট দশেক বেড়িয়ে আসবে,এই তার নিয়ম। তারপর দুধ-মুড়ি আর পাকা বেল খাবে।

সত্যশরণের গায়ে এখন কোট নেই—ফতুয়া। পকেটের মধ্যে সত্যশরণের ঘরের চাবিটা ঠুনঠুন আওয়াজ তুলল। সত্যশরণও আওয়াজ তুলল, বলল, সকালবেলা মেজাজ খারাপ করছিস কেন ?

ছেলে বলে 'ডক্‌বাবু,' মেয়েও খুব একটা সমীহ দেখায় না। বলে ওঠে, সকালবেলা খিদে বাড়াচ্ছি বাবা !

ওঃ ! তা ভাল—সত্যশরণ পা বাড়ায়।

রমলা এতক্ষণে কারণটা প্রকাশ করে। বলে, আচ্ছা বাবা, আমার যদি একদিন অসুখ করে, যদি উঠতে না পারি, সংসার থেমে পড়ে থাকবে ?

সত্যশরণের অবশ্য অভিযোগের মর্মার্থ বুঝতে অসুবিধে হয় না। তবে প্রকাশ করে না। বলে, তা তুই না বললে কে কী করবে ?

রোজ আমায় বলতে হবে ? রমলাকে হঠাৎ যেন তর্কে পায়, আমার যদি একদিন অসুখ করে, যদি উঠতে না পারি ?

সত্যশরণ তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যেতে যেতে বলে, খামোকা অসুখই বা করতে যাবে কেন ? যতসব অপয়া কথা।

বাবার ওই পালানো দেখে রমলার হাসি এসে যায়। আর ওই হাসিটার সঙ্গে সঙ্গে মনের ভারটা যেন ঝরে পড়ে খানিকটা।

নেমে এল পার্থ। একেবারে অম্লান সরল নিরপরাধ মুখ। এসেই বলে উঠল, এই দিদি, রেগে আগুন হয়ে আছিস তো ?

রমলাকে এখন চেষ্টা করে গম্ভীর হতে হল। তবে পার্থ সেই গাম্ভীর্যটাই দেখতে পেল। রমলা বলল, হঠাৎ রাগতে যাব কেন ?

যাবি না-ই বা কেন ? রাগের রাইট রয়েছে তোর। কাল তোকে যে একখানা লাগিয়েছি—

কী লাগিয়েছিস মনে হচ্ছে ? রমলা বলে, থাপ্পড় ?

তা প্রায় তাই। দেখ্, দিদি, রাত্রে ওই জানলা-ফানলা বন্ধ করে দিলেই মেজাজটা কেমন খারাপ হয়ে যায়।

রমলা বেলের শাঁসে পরিমাণ মতো চিনি দিতে দিতে বলে, আর কিছুতে মেজাজ খারাপ হয় না ?

আর কিছুতে ? পার্থ খাবার টেবিলটার ওপরই উঠে বসেছিল, বলল, আচ্ছা দেখি, হুঁ তাও হয়। বাবার দিকের তরকারি পাতে দিতে এলে হয়।

কথাটা মিথ্যে নয়। সত্যশরণের যত দিশী তরকারিতে ঝোঁক— থোড় মোচা, কচু কাঁচকলা, ডেঙো পুঁই, উচ্ছে পলতা হ্যানো-ত্যানো, আর পার্থর ঠিক ওইগুলো দেখলেই মেজাজ খারাপ হয়ে যায়।

রমলা জানে, তবু রমলা ওই কৈফিয়তটাকে গুরুত্ব দিল না, বলল, ওটা তো বানানো কথা। আসল কথাটা বলার সাহস থাকে তো বল্।

পার্থ ঝপ করে নেমে আসে, দিদির দুই কাঁধে হাত রেখে বলে, সাহস হচ্ছে না, ভয় করছে, কান মুলে দিবি।

হুঁ। সেই ভয়ে তো সারা হয়ে যাচ্ছিস! কান মুললে তুমি আমায় মুলবে।

পার্থ লজ্জায় লাল হয়ে যায়—এই দিদি প্লীজ! এত রেগে থাকিস না। সত্যি আমি নিজেই নিজের কান মুলছি ছাখ। সত্যিই নিজের কান দুটো দু হাতে ধরে বলে, অভয় দিস তো বলি।

বলবার কিছু নেই—রমলা বলে, যার চোখ আছে, বুদ্ধি আছে, খেয়াল আছে, তাকে খুলে বলতে হয় না।

ও তার মানে ধরে ফেলেছিস? পার্থ বলে, আমি ভাবছিলাম তুই ভালমানুষ, এ সবের কী-ই বা জানিস—হঠাৎ থেমে যায় পার্থ।

রমলার মুখটা কি অন্য রকমের হয়ে গিয়েছিল, নাকি রমলা শুধু শুধুই অন্যদিকে মুখ ফেরাল? কিন্তু রমলা হেসেই উঠল। পার্থ নিশ্বাস ফেলে বাঁচল।

রমলা বলল, তা বলেছিস কিছু ভুল নয়। কালা কি জানে গানের সুর? কিন্তু কালারা আবার চালাক হয় বেশী রে!

পার্থ দিদির কাঁধ দুটো আবার জোরে নেড়ে দিয়ে বলে, বাবা, সাধে কি তোকে এত ভয় করে! রামচালাক!

রমলা একেবারে অন্য কথায় এল, সন্দিগ্ধ গলায় বলল, সকালে জামা ছেড়েছিস? নাকি বাসি জামায় দিলি আমার কাচা কাপড়টা ঘুচিয়ে?

পার্থ বাঁচল, বলল, বাসি? জামা কি ফল দুধ মাছ, তাই বাসি হবে?

আচ্ছা খুব হয়েছে, ছেড়েছিস কি না তাই বল্।

ও নো।

তার মানে গেল আমার কাচা কাপড়টা।

ছাখ দিদি, তোর এই কুসংস্কারটা এখনো ছাড়তে পারলি না? কই, কী হয়েছে কাপড়ে দেখি?

দেখবি মানে ? দেখবার কিছু আছে নাকি ?

তবে ? যা অদৃশ্য তা নিয়ে মাথা ঘামাবার কী আছে ?

রমলা বলে, মাথা তো যত অদৃশ্য বস্তু নিয়েই ঘামে রে !

নাঃ, তুমি আজ রহস্যময়ী হয়ে উঠেছ, পার্থ বলে, মনে হচ্ছে রাগ যায়নি।

রমলা নিজেকে সামলে নেয়। বলে, থাম্ বাবা ! খেতে-টেতে হবে না কি ?

রোসো, আগে গৃহকর্তার নৈবেদ্য সাজানো হোক।

হয়েছে। তুই জামা ছেড়ে আয় তো।

আসছি। হাসবি তো ? বল্ হাসবি ?

তা তোর কথায় তো মরা মানুষও হেসে ওঠে। বলে রমলা বাবার খাবারের থালাটায় ফিনিসিং টাচ্ দিতে বসে। একটু নেবু, একটু নুন, একটু মরিচ গুঁড়ো, এসব সত্যশরণের বেল খেতেও লাগে।

পার্থ এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলে, ডক্‌বাবু কি এখনো টাকা গুনছেন নাকি ?

যদিই গোনে, তোর লাভ বই লোকসান আছে ?

আমার ? আমার লাভ-লোকসান কিছুই নেই বাবা ! ভদ্রলোক যে অদূর ভবিষ্যতেই আমাকে ত্যাজ্যপুত্তুর করবেন সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

তার মানে নিঃসন্দেহে ত্যাজ্যপুত্তুর হবার মতো কাজ করবি ভেঁজে আছিস ?

দিদি রে, তুই এত বুঝতে পারিস ! তবে তোর আনুকূল্য ব্যতীত কিছুই হয়ে উঠবে বলে মনে হয় না।

আমি আবার কী আনুকূল্য করব ?

তুই-ই সব করবি। পার্থ একটু গভীর গলায় বলে, চিরকাল তুই-ই তো আমাকে ওই ভদ্রলোকের রোষবহ্নির ঝাঁজ থেকে রক্ষে করে আসছিস।

ভালই কথা, তবু কেন কে জানে হঠাৎ রমলার চোখে জল এসে যায়, রমলা মুখ ফিরিয়ে বলে, আচ্ছা, খুব হয়েছে থাক্। ভূতের মুখে রামনাম!

ভূতেরাও রামনাম করে রে দিদি, মনে মনে করে, বলে হাসতে হাসতে চলে যায় পার্থ।

রমলা সেই দিকে তাকিয়ে থাকে। রমলার মনে হয় রাতের অন্ধকারে মানুষ অকারণে ভয় পায়। রমলার মনে হয় আজকের সকালের রোদটা কী সুন্দর!

দূরের ওই কী যেন গাছটার পাতার ঝিলমিল কী সুন্দর!

এই মধুর সৌন্দর্যের ওপর হাতুড়ি পিটতে পিটতে গৃহকর্তা গৃহে ফেরেন।

রমলি, তোর ওই নীলকণ্ঠটা এমন বেয়াদব কেন? সিঁড়ির সামনে ওঁর স্যাণ্ডেল। আমি ব্যাটা তালি-মারা ক্যাম্বিস শু পরে বেড়াচ্ছি, আর উনি নতুন স্যাণ্ডেল কিনে চোখের সামনে মেলে রেখে দিয়েছেন! বলে দিস তোর চাকরকে, এসব বেয়াদবি চলবে না।

রমলা বাবার খাবার এগিয়ে দিয়ে বলে, চাকর আমার নয় বাবা, তোমারই।

ও কথা ছাড়্। আমার চাকর! হুঁঃ! আমায় বড্ড মানে! আমি বারণ করলে হয়তো আমার শোবার ঘরের সামনেই রেখে দেবে নতুন চটি। বারণ করে দিবি, বুঝলি?

ওসব দিকে নজর না দেওয়াই ভাল বাবা।

না দেওয়াই ভাল? সত্যশরণ একথাবা দুধ-মুড়ি মুখে পুরে বলে, চমৎকার! সাধে বলছি তোমার চাকর! এসব তোমারই পদ্ধতি। আমাদের নীতি ছিল সব দিকে নজর দেওয়া।

ওটা ঠিক নয়। ওতে ভয় কমে যায়।

ভয় কমে যায়?

হুঁ। যাবে না? ফি হাতে বকাবকি শুনতে শুনতে ভাববে, ওরা তো সবতাতেই খ্যাচ্‌খ্যাচ্ করে, তবে যা ইচ্ছে করি।

তোমাদের কালকে তোমরাই জানো। বলে সত্যশরণ নিজের কালের ফ্যাশান অনুযায়ী বেলের শাঁস খেতে থাকে।

রমলা মুখ টিপে হাসে। পার্থ তো দিদির শরণ নিয়ে বসে আছে। তার মানেই ডক্‌বাবুর সঙ্গে সংঘর্ষ।

মনের সুরটা হঠাৎ যেন বদলে গেল। এখন পার্থ নামের সদ্য-তরুণ ছেলেটা আর নয়না নামের ওই কিশোরী মেয়েটা যেন কৌতুকের বস্তু বলে মনে হচ্ছে রমলার কাছে। কেমন করে হল? ওদের মধ্যে একজন রমলার শরণ নিল বলে? রমলার মুখাপেক্ষী হল বলে? রমলার আনুকূল্য ব্যতীত কিছুই হওয়া সম্ভব নয়, একথা স্পষ্ট গলায় স্বীকার করল বলে?

মনের অন্তরালে কী যে ঘটে! কে জানে কী! তবে দেখা গেল রমলা আজ ছাদে উঠে পাশের বাড়ির ছাদের দিকে লক্ষ্য করে চেঁচিয়ে ডাকছে, দু'দিন আসিসনি কেন রে?

তারপর দেখা গেল ও-বাড়ির ছাদের মেয়েটা এ-বাড়িরই ছাদে। রমলা আনুকূল্য দিতে থাকে। ছাদ থেকে নেমে আসে, শুধু আসার আগে বলে আসে, এক্ষুণি চলে যাবি না তো? একটু বোস। তোর বাবার জন্যে দুখানা ছোলার ডালের কচুরি দেব। ভাজছি, অফিস থেকে ফিরে খাবেন।

কচুরি ভাজা! অতএব দু' মিনিটেই আবার উঠে আসার সম্ভাবনা নেই, চলে যাওয়াও চলবে না, তবে আর কী করবে বইপাগল মায়ের বইপাগল মেয়ের যে ঘরে দেদার বই আছে সেই ঘরে ঢোকা ছাড়া?

তোমার দিদি হঠাৎ এমন উদার হয়ে গেলেন কেন বল তো? বলে নয়না বই বাছতে বাছতে।

পার্থ হেসে হেসে বলে, আছে ব্যাপার।

আমার কিন্তু ভয়-ভয় করছে।

বাঃ, উদার হলে আবার ভয় কী?

কি জানি বাবা, ফাঁদে-টাঁদে ফেলে কিছু শাস্তি-টাস্তি দেবেন না তো ?

এই ধ্যেৎ ! দিদির সম্পর্কে এই রকম ভাবিস না খবরদার !

ভাবি না, তবে আশ্চয্যি লাগছে। পাহারার জ্বালায় তো— একটু হেসেই নয়না কথাটাকে পূর্ণ পরিণতির রূপ দেয়।

পার্থ হাসে, খুব একখানা চাল চাললাম।

কী ? নয়না চকিত হয়।

চালটা অবশ্য নতুন নয়, চিরকালের, তবে নতুন করে চাললাম। এক ডোজেই রাগ থেকে অনুরাগ, প্রতিপক্ষ থেকে স্বপক্ষ। বুদ্ধি হ্যাজ। বুঝলি ?

উঃ, কী বুদ্ধির বড়াই ! ডোজটা কিসের শুনি ?

কী আর ! পুরনো ঘি নতুন কৌটো। 'শরণাগত দীনার্ত পরিত্রাণ পরায়ণে' মন্ত্র ঝাড়লাম।

অমনি হয়ে গেল ?

দেখলিই তো হল কি না। ডেকে বাড়ি আনল।

তারপর আবার বাবার জন্যে ছোলার ডালের কচুরি ভাজতে গেলেন !

হাসিতে গুঁড়ো গুঁড়ো হয় দুজনে।

তারপর হঠাৎ আসছি বলে নেমে যায় পার্থ। রান্নাঘরে গিয়ে হাজির হয় নীচতলায়। রমলা কচুরি ভাজছিল তখন।

পার্থ লজ্জিত হল। মনের অগোচরে পাপ নেই, পার্থ যে হঠাৎ চলে এল তার কারণ কি একটি তীক্ষ্ণ সন্দেহ নয় ? দিদি কোথাও লুকিয়ে তাদের ওয়াচ করছে না তো বাবা ! যা সব বেপরোয়া কথা চালালাম দিদির ব্যাপারে !

রান্নাঘরে এসে লজ্জিত হল, এক থালা কচুরি বেলা হয়ে রয়েছে, আরো এক থালা নিয়ে ভাজছে। তার মানে অনেক সময়সাপেক্ষ ব্যাপার।

পার্থ এসে পড়েই বলে ওঠে, ব্যাপার কি দিদি ? দারুণ দারুণ

গন্ধ বার করেছ দেখছি! দুখানা পাব না?

না, পাবি না। সব আমি খেয়ে নেব।

আহা, সেটা তো একটা পরম সঞ্চয় হত। শুনছি নাকি পাড়া-পড়শীকে বিলোবে?

বাবা, শুনতে পেয়ে ছুটে এসেছিস? সত্যি মিথ্যে যাচাই না করেই?

ওর আবার যাচাই কী, সকলেই জানে তুমি দানশীলা পুণ্যবতী।

রমলা হেসে ফেলে, ওটা আবার বেঁচে থাকতে জানা যায় নাকি? ও তো শোক-সংবাদের ভাষা।

কখনো কখনো লোক-সংবাদেও ও ভাষা শোনা যায় রে দিদি! কিন্তু কথায় কথায় আসল কথাটা চাপা দেবার চেষ্টা করছ বলে মনে হচ্ছে। গরম গরম দুখানা এদিকে ছাড় দিকি।

কচুরির ভাগ্যি বল্! রমলা হেসে একটা প্লেটে তোলে কটা—তুই বাবা হিংসুটে আছিস। অন্যকে দেব শুনে ছুটে এসেছিস, খিদে না থাকলেও খেতে চাইছিস।

বাঃ, খিদে নেই কে বলল?

তুই নিজেই বলেছিস একটু আগে।

পার্থর মনে পড়ে যায়। সত্যিই বটে। দিদি কচুরি নিয়ে আসছে শুনেই সে বলেছিল—খিদে নেই। কিন্তু পার্থ তো হারবার ছেলে নয়, তাই বলে, জানো না পুরাণে আছে সুগন্ধে ক্ষুধার উদ্রেক।

আছে বুঝি, পার্থ পুরাণে বোধ হয়? এই নে—

ও বাবা, তাই বলে এত!

আহা নয়নাকেও দি গে যা দুখানা—

কী? আমি ওর জন্যে খাবার বয়ে নিয়ে যাব? চাকরের মতো? দায় পড়েছে আমার। বলে পার্থ একটা কচুরি তুলে নিয়ে মুখে পোরে।

রমলা হাসে, এই, তবে ডাক্ ওকে।

ডাকা? সেটা পারি। পার্থ হাঁক পাড়ে, এই নয়না! কচুরি ঠাণ্ডা হয়ে গেল!

রমলা ভাবে যা ভেবেছিলাম তা ঠিক নয়। একটু প্রেম-প্রেম খেলা ছাড়া কিছু না। আসলে ছেলেমানুষিটাই বেশী। অনিষ্টকর নয়।

এই ভাবেই দিদিকে ঠাণ্ডা করে ফেলে পার্থ। এবং দিদির মনোভাব ধরে ফেলে অগ্রসর হতে থাকে শনৈঃ পন্থা।

রমলা ভঁাড়ারের জিনিসপত্র রোদে দিচ্ছিল।

রোদ দেখলেই রমলার যেন মাথায় টনক নড়ে। রমলা ভাঁড়ারের টিন বোতল টানাটানি করতে বসে, রমলা দেরাজ আলমারি ফাঁকা করে তোলা কাপড় জামা শাল র‍্যাপার রোদে দিয়ে নতুন করে ন্যাপ্‌থলিন কালোজিরে দিয়ে তাদের তাজা রাখবার সাধনা করতে বসে, রমলা নীলকণ্ঠকে তুপুরের আরামের শয্যাতল থেকে তুলে বিছানা রোদে দেওয়াতে বসে।

সত্যশরণ দেখতে পেলে বলে, রমলি, তোকে কি ভূতে পেয়েছে? এই গরমে বিছানা রোদে দেওয়াচ্ছিস? রাতে শুতে পারা যাবে?

রমলার তৎক্ষণাৎ জবাব, না পারা যায় এক বালতি জল ঢেলে নিলেই তো চলবে বাবা!

সত্যশরণ হাওয়া।

তবে পার্থ অমন এক কথায় হাওয়া হয় না, সে তর্ক করে, তোর নিজের শরীরটার থেকে ওই আমসিগুলো অনেক দামী দিদি? বলে, নিজেকে একটু ন্যাপ্‌থলিন কালোজিরে দিলে ভাল হত দিদি! ছাতা পড়ে যাচ্ছিস!

রমলা কখনো হাসে, কখনো বকে ভাগায়, বলে, ছুটির তুপুরে তোর আর কাজ নেই? তাই আমার সঙ্গে লাগতে এলি? লেখাপড়ার দরকার না থাকে ঘুমোগে যা।

তা এসব পার্থর প্রাক্ প্রেম-যুগের।

এখন পার্থ অন্য কথা বলে। যেমন একদিন, রমলা ভাঁড়ারের জিনিস রোদে দিচ্ছিলো, পার্থ পিছন থেকে এসে গলা ধরে ঝুলে

পড়লো, কী বাজে কাজ নিয়ে মরছিস দিদি? চল্ না একটা ছবি দেখতে যাই।

ছবি?

রমলা অবাক হয়ে বলে, কিসের ছবি?

আরে বাবা সিনেমা, সিনেমা! তোকে আবার সেকেলে পিসিমা-দের মতন বিশদ বোঝাতে হয়। একটা ভাল বই এসেছে ইন্দিরায়—

রমলা বড়িগুলো নেড়েচেড়ে দিয়ে বলে, সিনেমা আমি দেখি?

আরে বাবা, দেখতে দোষ আছে কিছু?

গুণও কিছু নেই।

একদিন নয় নির্গুণ কাজই করলি বাবা। শরৎচন্দ্রের বই, দেখলে খারাপ হয়ে যাবার ভয় নেই।

রমলা একটা তাড়া লাগিয়ে বলে, খারাপ হয়ে যাবার ভয়েই বুঝি তোদের ওই সিনেমা থিয়েটার দেখি না?

পার্থ অম্লান মুখে বললে, তাছাড়া? আমরা পাপী-তাপীরা উচ্ছন্নের পথে এগিয়ে যাবো, আর তুই উচ্চলোকে বসে সেই অধোগতি লক্ষ্য করে আত্মপ্রসাদ অনুভব করবি. এই তো? আর কি!

তবে তো ভেতরের রহস্য বুঝেই ফেলেছিস।

না রে দিদি, প্লীজ চল্। একটা বন্ধু জোটাতে পারলাম না। নাক-উঁচুরা বলে কিনা, বাংলা ছবি আবার দেখতে যাবো কী! আমার কিন্তু মাঝে মাঝে বাংলা ছবি মন্দ লাগে না, মুখবদল হয়। যাচ্ছি তাহলে, দুটো টিকিট নিয়ে আসি, ইভনিং শোয়ের।

রমলার বুঝতে বাকি থাকে না কিসের এত তোড়জোড়। দুটোর জায়গায় তিনটে এসে যাবে। এবং পার্থ বলবেই নয়নাটা সিনেমা-সিনেমা করে এমন হ্যাংলামি করে! অথচ ওদের বাড়িতে যাওয়া-টাওয়া তেমন নেই। তাই ভাবলাম ওরও একটা—বাবাকে ম্যানেজ করবি।

রমলা দুষ্টু হাসি হেসে বলে, একটাও বন্ধু জুটলো না বলে এই

বুদ্ধু দিদিটাকে বয়ে নিয়ে যাবি? তার থেকে বান্ধবীকে নিয়ে যা না।

বান্ধবী! সেটি আবার কি বস্তু?

কেন, মানে বুঝতে পারছিস না বুঝি?

ও হো হো, বাবা! দিদি! তোর পেটে পেটে এত! না বাবা, পরের বাড়ির ব্যাপারে আমি নেই। তারপর হয়তো ওর বাবার সামনে পড়ব, আর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। তার থেকে তোতে আমাতে চলে যাব। নিশ্চিন্ত।

রমলা মনে মনে হাসে। রমলা ওদের প্ল্যান এগিয়ে দেবার ভার নেয়—তবে আন্ টিকিট।

থ্যাঙ্কু দিদিমণি! মেনি মেনি থ্যাঙ্কস্। যাক, আজ একটা পুণ্যকর্ম করতে পারছি—

বলে লাফাতে লাফাতে চলে যায় পার্থ টিকিট কাটতে।

রমলা মতলব ভাঁজে কি ভাবে ব্যাপারটা ম্যানেজ করবে।

কারণ একথা ভাবতে পারে না রমলা টিকিট পার্থর কেনাই আছে। এবং তার হিসেবেই আছে দিদি যাবে না।

একটু পরেই রমলা নয়নাকে ডাকে ছাত থেকে। কি রে, কাল আসিসনি যে? আয় না।

ছাতে নয়নার মাও ছিল, সে বলে, ও যে বলছিল কোন্ বন্ধুর বাড়ি যাবে।

আহা, আমিও তো ওর একজন বন্ধু। সমবয়সী বন্ধু। কী বলিস রে নয়না?

নয়না মনমরা হয়েই আসে।

নয়না ভাবে এখন আবার কোন্ ফেরে পড়তে হয়!

রমলা ওর সঙ্গে আবোলতাবোল গল্প করতে থাকে।

একটু পরেই পার্থ আসে।

এখানে নয়নাকে দেখে একটু অস্বস্তি বোধ করে পার্থ।

কিন্তু রমলা ওদের তাক লাগিয়ে দিয়ে বলে, ওরে পার্থ, তোকে

আমি মুখ দেখাতে পারছি না রে! হঠাৎ সেই কলিক পেনটা যেন চিড়িক দিয়ে উঠছে মনে হচ্ছে। যদি সিনেমা হলে গিয়ে মারমূর্তি ধরে?

তা রমলার ওই কলিক পেন যখন মূর্তি ধরে তখন মারমূর্তিই ধরে। তবে সেটা দৈবাৎ। খুব অনিয়ম অত্যাচার হলে। খামোকা হাসতে হাসতে চিড়িক দিয়ে ওঠা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

পার্থও চালাক ছেলে।

পার্থ বলে ওঠে, খবরদার দিদি, বাজে গুলতাপ্পি দিস না। সিনেমার নামেই অমনি তোর কলিক পেন জেগে উঠলো। দেখছিস নয়না? এমন অদ্ভুত চীজ দুনিয়ায় আর দুটি দেখবি না। ওসব কথা রাখ্ দিদি। যা, তোর কি ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর মারাত্মক সব কাজ আছে সেরে নিয়ে সাজগোজ করে নে। ওঠ্।

রমলা ওঠে না, বরং একটা বালিশ টেনে নিয়ে শুয়ে পড়ে বলে, না রে পার্থ, লক্ষ্মীটি রাগ করিস না, সত্যি একটু কেমন যেন মনে হচ্ছে।

ঠিক আছে, টিকিট দু'খানা ছিঁড়ে হাওয়ায় উড়িয়ে দিই। বার করে পকেট থেকে।

আহা-হা, রাখ্ রাখ্—রমলা হাঁ হাঁ করে ওঠে। যেন সত্যিই বিশ্বাস করছে পার্থ ছিঁড়বে ও দুটো।

তাই হাঁ হাঁ করে বলে, রাগ করিস না। শোন্, আমার বদলে বরং নয়না দেখে আসুক।

নয়না!

পার্থ আকাশ থেকে পড়ে।

যেটা সাজানো।

নয়নাও আকাশ থেকে পড়ে, সেটা সত্যি। রমলার কাছ থেকেই প্রস্তাবটা আসবে, এমন অভাবিত কথা সে ভাবেনি।

সে বলে ওঠে, য্যাঃ।

ওমা, এর মধ্যে আর য্যাঃর কী আছে? মাকে বলে যা বরং ঘটনাটা। বলিস আমি বিশেষ করে বলেছি।

পার্থ বীরদর্পে মাথা নাড়ে, নো নো দিদি, আমি ওসবের মধ্যে নেই। পাড়ার মেয়েকে সিনেমায় নিয়ে গিয়ে ফ্যাসাদে পড়বার মধ্যে আমি নেই।

রমলাও আকাশ থেকে পড়ে।

ওমা, এর আবার ফ্যাসাদ কী? টিকিটটা ফেলা যাচ্ছে—

আরো কিছুক্ষণ চালাকির চাল চলে।

নয়না বিপন্ন বিমূঢ়ের ভঙ্গীতে 'না না রমলাদি, আমি পালাই—' বলে সন্ত্রস্ত ভাব দেখায়।

পার্থ বার বার বলে, তোমার কলিক পেনটি আর উঁকি মারবার দিন পেলো না। যদি বা অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে মহামানবীটিকে এই নিতান্ত নগণ্য কাজটি করতে রাজী করিয়েছিলাম—

রমলা পেটের নীচে বালিশ দেয়।

শেষ পর্যন্ত নেহাত দায়ে পড়েই নয়নাকে ঘাড়ে করে সিনেমায় যেতে হয় পার্থকে। তবে যাবার সময় বলে গেল, ডক্‌বাবুর কানটাকে ম্যানেজ করিস।

বাইরে বেরিয়ে নয়না বলে, এটা কী হল?

পার্থ আত্মস্থের ভঙ্গীতে বলে, যা হবার, ঠিক তাই হয়েছে। প্ল্যানমাফিক।

তা প্ল্যানটা তো জানতাম তোমার। তার মধ্যে দিদি কিভাবে ঢুকে পড়লেন?

ঢোকালাম। ঢোকানোটাই নিরাপদ মনে করলাম।

আর উনি যদি সত্যিই যেতেন?

ক্ষেপেছিস? আমি চিনি না দিদিকে?

কিন্তু—

নয়না চিন্তিতভাবে বলে, আমিও তো অনেকদিন ধরে চিনি, ঠিক মিলোতে পারছি না।

পার্থ হেসে উঠে বলে, আরে বুঝছিস না, দিদিকে হঠাৎ উদারতার নেশায় পেয়েছে।

ছবি দেখে এসে পার্থ ভীতের ভঙ্গীতে রমলার ঘরে ঢোকে, দিদি!

রমলা এ সময় একটু সেলাই-টেলাই নিয়ে বসে। তাই বসেছিল।

পার্থ কপালে হাত ঠেকিয়ে বলে, তাহলে আছিস?

রমলা বোধ করি একটু ভুলেই গিয়েছিল, বলে, থাকব না তো কোথায় যাব?

কি জানি, আমি তো ভাবতে ভাবতেই আসছি। হয়তো তোকে শ্মশানে নিয়ে গেছে।

এতদূর ভাবতে পারলি?

পারলাম। তবে সত্যি দিদি, তুই যাসনি ভালই। নিষ্কৃতির হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলি। নইলে কেঁদে মরে যেতিস। নয়নার তো ফোঁস ফোঁস করতে করতে সর্দি ধরে গেল। যাক, ভাল আছিস তো?

হুঁ।

কিছু ওষুধ খেয়েছিলি? বেরিয়ে মনে পড়ল তোর কোন ওষুধের ব্যবস্থা করে গেলাম না।

তুই আর কী ব্যবস্থা করবি? আমার ও ওষুধ তো আমার কাছে থাকেই। চল্, খাবি চল্।

হ্যাঁ। দারুণ ক্ষিদে পেয়েছে।

এটাও বানানো কথা। ইণ্টারভ্যালের সময় চা ও কাটলেট খেয়ে নিয়েছে দু'জনে।

রমলা সেটা বুঝতে পারে না।

বলে, আহা আমারও মরণ, বিকেলে যে কিছু খাসনি মনেই নেই। চল্ চল্।

চল্। দিদি, ডক্‌বাবুর কানে ওঠেনি তো পাড়ার মেয়েকে নিয়ে উড়ছি?

উড়ছিস? কথার কী বাহার ছেলের! আমি তোর ডবল-বয়সী দিদি না?

পার্থ মাথা নাড়ে, উঁহু। আমি তোর দাদা। তুই এখনো নাবালিকা।

এই খেলা চলে প্রায়ই।

একদিন রমলাই নিজে থেকে বলে। মুক্তাঙ্গনে কী একটা ভাল থিয়েটার হবে—কাগজে লিখেছে, দেখবি না?

নাঃ। কেবলই নিজে সব কিছু করি, তুই কিছু দেখিস না শুনিস না। আমার বিবেকে বাধে।

ও, কী বিবেকবান ছেলে! তা হঠাৎ তোর বিবেক এত চাড়া দিয়ে উঠল কেন রে? সেই কোন্ ছোটবেলা থেকে তো সিনেমা থিয়েটার চালাচ্ছিস।

চালিয়েছি—পার্থ গম্ভীর গলায় বলে। বোধ-টোধ ছিল না তখন। এখন বুঝতে পারি কতদূর স্বার্থপরতা করে চলেছি।

বোধশক্তিটা একটু কমা। রমলা বলে, যাবি তো যা।

না বাবা, পকেট গড়ের মাঠ। এ মাসের 'পকেট-মানি' এখনই খতম। কাল থেকে হেঁটেই কলেজ যেতে হবে।

রমলা মনে মনে বিদ্রূপের হাসি হাসে।

পকেট-মানি আর কুড়ি তারিখেই খতম হবে না! নতুন ভালবাসার বান্ধবীকে কি আর টুকটাক্ উপহার-টুপহার কিছু না দিতে হচ্ছে?

হাত-খরচটা আসে অবশ্য সত্যশরণের ট্যাঁক থেকেই। কিন্তু আসে রমলার মাধ্যমেই। এবং মাঝে মাঝেই রমলা বাবার কাছে অনেক কারণ দর্শে কিছু বেশী আদায় করে। বড় হয়েছে—বন্ধু-বান্ধবদের কাছে মুখ থাকে না। ইত্যাদি।

তাছাড়া সংসার খরচের টাকা থেকেও সাপ্লাই করেই। আজ বলে নয়, পার্থের ছেলেবেলা থেকেই। এখন তো আরোই দরবার বেড়েছে।

হেঁটে কলেজ যেতে হবে!

পার্থর কথার ধরনই ওই।

চুল বড়ো হয়েছে—বললে অম্লানবদনে বলে, পয়সার অভাবে ছাঁটতে পারছি না।

রমলা জানে, তবু রেগে ওঠে, বলে, পয়সার অভাবে হেঁটে কলেজ যাবি? এমন দুরবস্থা ঘটেছে তোর? ধাড়ী বয়সে মারই খেতে হবে তোকে দেখছি।

তারপর হাতে টাকার গোছা ধরে দিয়ে বলে, নে, দু'খানা টিকিট কিনে নিয়ে আয়, নয়নাটাকেও নিয়ে যা।

আবার নয়না? না! তুমিই ওর অভ্যেস খারাপ করে দিলে। ওকে আর কেন বাবা সব সময় ধোবার গাধার মতো বোঝা বয়ে—

রমলা হালকা গলায় হেসে ওঠে। বলে, আর পেটে ক্ষিদে মুখে লজ্জা কেন বাবা? নয়নাকে নিয়ে যেতে তোমার নিজেকে ধোবার গাধা মনে হয়, কেমন?

পার্থ কোন কথা না বলে টাকাটা নিজের মাথায় ছুঁইয়ে হঠাৎ দিদির পায়ের কাছ সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে।

ছেলেবেলা থেকে পার্থর এই কাজ।

দিদিকে হালকা রাখা।

দিদির ভার মুখকে ওর বড়ো ভয়।

এহেন আচরণে কেই বা ভার হয়ে থাকতে পারে!

বিশেষ তো এক স্নেহ-ভালবাসা ক্ষুধাতুরা নারীহৃদয়!

রমলা বিগলিত হয়।

রমলা বুঝতে পারে না, এগুলোর অনেকটাই পার্থর চেষ্টাকৃত।

মজা করতেই করে।

অতএব দামী টিকিট কেটে মুক্তাঙ্গন।

নয়না কিন্তু রমলা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হতে পারে না। ওর কেবলই ভয় হয়, রমলা ইচ্ছে করে ওদের দুঃসাহসের পথে ঠেলে দিতে চাইছে, এরপর হঠাৎ একদিন ভয়ানক একটা কিছু করে বসবে। হয়তো বাপের সামনে হাতেনাতে ধরিয়ে দেবে। অথবা—

এরকম সন্দেহ প্রকাশ করলে অবশ্য পার্থ বিরক্ত হয়, চটে ওঠে।

বলে, অত ছোট চশমা দিয়ে দিদিকে দেখো না।

দিদি কোন নীচতা করবে ?

পার্থ সে ভয় করে না।

অতএব পার্থর সুখের অবস্থা চলতেই থাকে।

দিদির আনুকূল্যে নয়নাকে নিয়ে সিনেমা যাওয়া, নয়নাকে নিয়ে বেলুড়, বোটানিক্যাল গার্ডেন, এমন কি একদিন ব্যাণ্ডেল চার্চ পর্যন্ত। প্রেমের পান্‌সি ভাসিয়ে নিয়ে কূলে পৌঁছতে যা যা করা পদ্ধতি সবই করতে থাকে ক্রমশঃ।

রমলা যেন হঠাৎ একরকম পুতুলখেলায় মেতেছে। কিন্তু কথা হচ্ছে, রমলা না হয় শরণাগত পরিত্রাণের নেশায় এই সর্বনেশে খেলায় মেতেছে, কিন্তু নয়না নামের মেয়েটার কি একটা বাড়ি নেই ? মা-বাপ নেই ? শাসন নেই ?

তা সে সমস্যাও চতুর কৌশলে সমাধা করে ফেলেছে রমলা। নয়নার মাকে একটি মধুর প্রলোভনের টোপ গিলিয়ে রেখেছে। কে না জানে সত্যশরণের সংসারে রমলাই সর্বেসর্বা, অতএব টোপ গিলতে দ্বিধা করেনি নয়নার মা।

নয়নার এবার হায়ার সেকেণ্ডারীর বছর না ? আর পার্থ একটা এম. এ. পড়ুয়া ছেলে না ? পাশের বাড়ির পড়শীর এটুকু উপকার করতে পারবে না ? না পারবে তো বিদ্যে-সাধ্যির মূল্য কী ?

বিনা মাইনের চাকর ত্রিভুবনের কোথাও পাওয়া না গেলেও বিনা মাইনের মাস্টার পাওয়া যায়। তাক বুঝে তাক করতে পারলে বেশ পাওয়া যায়। পার্থ সেই হিসেবের খাতায় একটি নতুন সংযোজন।

তবে নয়নার বাবার এই পরম উপকারটি চলছে নয়নার বাবার অজানিতে। এবং পার্থর এই পরোপকারের মহানুভবতাও তার বাবার অজ্ঞাতে। পুতুলের বিয়ে বিয়ে খেলা মেয়েতে মেয়েতেই চলে, পুরুষরা থাকেন অবোধের স্বর্গে।

কিন্তু সত্যশরণ লোকটা এমনিতেই একটু কম অবোধ, তার ওপর

আবার কাল করল তার অফিস। এক্সটেনশন-ফেক্সটেনশন না দিয়ে ফট করে ন্যায্য বয়সে রিটায়ার করিয়ে দিল এতদিনের বশংবদ লোকটাকে।

অথচ সত্যি কিছু আর সরকারী চাকরি নয় যে বয়সের কড়াকড়ি থাকবেই। সত্যশরণের বাবাই তো দশ বছর এক্সটেনশনে কাটিয়েছে। বাবার কর্মক্ষমতার সার্টিফিকেট ছিল, সত্যশরণেরই কি থাকতে পারত না? হিংসে করে সেটি দিল না কোম্পানির ডাক্তার। মিছিমিছি করে বলল, আপনি তো মশাই রোগের কুঠি। ডায়বিটিস, হাই প্রেসার, পায়োরিয়া—

সত্যশরণ মানবে কেন তা? তেড়ে-মেড়ে বলল, কস্মিনকালেও নেই ওসব।

ডাক্তারই বা মানবে কেন সেকথা? তার পাস-করা ডিগ্রী নেই? বচসার মুখে ডাক্তার বলে বসল, জাহাজের মাল খালাস করতে করতে লোহার সিন্দুকে তো জাহাজ জাহাজ মাল তুলেছেন মশাই, জানতে তো বাকি নেই কারো। আর কেন লোভ?

সত্যশরণ বলল, কী বললেন? আমি ঘুষ খাই? আমি অসদুপায়ে—

সেই যে ঠিকরে বেরিয়ে এল, আর গেল না। ওর সহকর্মীরা বলল, বেশী ঘাঁটালে পাছে হাটে হাঁড়ি ভাঙে, তাই রাগ দেখিয়ে চম্পট দিল ঘোষ।

একেই তো কর্মস্থলের এই ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়েই ছিল সত্যশরণ, তার ওপর বাড়িতে এসে বসে দেখল সংসারের মর্মস্থলেও আগুন জ্বলে ওঠার অবস্থা। অতএব আগুন হয়েই মেয়েকে এসে শুধাল সত্যশরণ, ওই মেয়েটা এ বাড়িতে সর্বদা ঘুরঘুর করে কেন রে রমলি?

রমলা জানত অদূর ভবিষ্যতেই একদিন এ কাঠগড়াতে দাঁড়াতে হবে তাকে। তাই উত্তরটাও ঠিক করে রেখেছিল। সহজ গলায় বলল, কোন্ মেয়েটা?

কোন্ মেয়েটা! দেখতে পাও না? সত্যশরণ কড়া গলায় বলে,

আমি তো এই ক'দিনেই ক্ষেপে যাচ্ছি। কেন ? কী করতে আসে ও ?

রমলা আরো সহজ গলায় বলল, ও, পদ্মর মা'র মেয়ের কথা বলছ ? ও আসে মার সঙ্গে, ঘুরঘুর করে। কী করব বল ?

পদ্মর মা ? পদ্মর মার মেয়ের কথা বলছি আমি ? সত্যশরণ নেচে-কুঁদে বলে, আমায় নাচিয়ে তুই মজা দেখছিস ? বলি ওই শ্যামল ঘোষালের মেয়েটা কী করতে আসে চব্বিশ ঘণ্টা ?

ও হরি ! তুমি নয়নার কথা বলছ ? তা কেমন করে বুঝব বাবা ? ও তো চিরকালই আসে।

চিরকালই আসত বলে চিরকালই আসবে ? সত্যশরণ তেড়ে উঠে বলে, যখন ঘাগরা পরত তখন আসত আসত, কাপড় পরা ধাড়ি ধিঙ্গি মেয়ে আসে কী করতে ? আর এসেই ওই লক্কা ছোকরার ঘরে ঢোকে কী করতে ?

ও তো পার্থ'র কাছে পড়ে।

কেন, কেন ? সত্যশরণ আবার নাচতে থাকে, মাস্টার রেখেছে ঘোষাল আমার ছেলেকে ?

রাখা আবার কী বাবা ? তোমার যদি একটু সামাজিকতা জ্ঞান থাকে ! পাড়ার লোকের উপকার করে না মানুষ ?

করে, তাই তো ! কই, পাড়ার লোকের বাড়িতে মড়া মরলে তো পোড়াতে যেতে দেখি না তোমার ভাইকে। পাড়ার লোকের আধি-ব্যাধি হলে সেবা করতে ছুটতে দেখি না। পরোপকারের আর পদ্ধতি খুঁজে পেল না ?

রমলা এবার মেজাজ দেখায়, তা আমায় বলছ কেন, ছেলেকেই বল না।

ছেলেকে ? সত্যশরণ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে, ছেলেকে বলব আমি ? ছেলে কবে আমার এত বাধ্য হল ?

আমারই খুব বাধ্য বুঝি ?

তোমার কথা ছেড়ে দাও। তুমিই তো আস্কারা দিয়ে দিয়ে ছোঁড়াকে এত পাহাড় করে তুলেছ। তবে পড়শীর মেয়ের সঙ্গে লভ্-

টভ্ করা সহ্য করব না আমি—তা বলে দিচ্ছি।

আঃ বাবা, কী যে বল! ও তোমার ছেলে না? বাবা হয়ে তুমি—

বাবা হয়ে তা কি? হক্ কথা বলতে সত্যশরণ ভয় খায় না। ছেলে না হয়ে যদি বাপ হত, তাহলেও ছেড়ে কথা কইতাম না, তা জেনে রাখিস। তুই বলে দিবি ওই বাচাল মেয়েটাকে, এখানে এসে এত ঘুরঘুর করা চলবে না।

রায় দিয়ে চলে যায় সত্যশরণ।

কিন্তু রমলা বাবার রাগকে খুব একটা গুরুত্ব দেয় না। বাবা এখন ওইভাবে মেজাজ দেখাল। আবার হয়তো বাবার চোখেও পড়বে না বাড়িতে কে আসছে, কি না আসছে।

অবশ্য রমলা আজকাল একথা ভাবতে বসে, এবার একটা কিছু করতে হবে। অন্য আর কি, আস্তে আস্তে বাবাকে নরম করা। বাবাকে বোঝানো, বাবা, এতে তোমার ক্ষেপে ওঠার কিছু নেই। এমন তো নয় ওরা নীচু ঘর। বরং আমরা শূদ্র, ওরা ব্রাহ্মণ। তাছাড়া এ যুগে জাত-গোত্তর নিয়ে অত শুচিবাই করা চলে না। দোহাত্তা ছেলেমেয়ে এই রকম 'ভাব' করে বিয়ে করছে। বাপ মা কী করবে? ত্যাগ করবে? কত ত্যাগ করবে লোকে? তা হয় না বাবা, কোন একটা ঘটনা যখন সমাজে হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ে, সমাজ রুখতে পারে না, তখন মেনেই নেয়। বলবে, ছেলেবেলা থেকে দুজনের মেলামেশা, মন পড়ে গেছে, তুমি আর প্রতিবন্ধক হয়ো না বাবা!

বাবাকে কী বলে বোঝাবে, অনবরত সেই সব ভাষা, যুক্তি, দৃষ্টান্ত রমলা মনে মনে আওড়ায়। বাবাকে নোওয়াতে পারবে। এ বিশ্বাস রাখে রমলা। নিজের শক্তি সম্বন্ধে তার অগাধ আস্থা।

কিন্তু রমলার এত দায় কেন?

রমলার এমন পরিবর্তন কেন? রমলা কি ওই প্রেম-ট্রেম সুচক্ষে দেখতো?

রমলার এও এক সুখানুভূতি।

ওদের 'প্রেম' আমি ওদের হাতে তুলে দিচ্ছি, ওদের সাধ্য সাহস ছিল না, আমি অভয়মূর্তি নিয়ে ওদের আকাঙ্ক্ষিত বস্তুটিকে ওদের আয়ত্তের মধ্যে এনে দিচ্ছি, আর আমিই ওদের জন্যে আহরণ করে দেব ওদের 'জীবন' ওদের 'আনন্দ' ওদের 'সার্থকতা'।

এ এক অনির্বচনীয় সুখ।

'আমি না হলে সংসারের চাকা এক তিল নড়ে না' এই আত্মপ্রসাদের সম্বলটুকু নিয়েই তো এত বড় জীবনটা কাটিয়ে এল রমলা।

কোনদিন 'যৌবনবেদনা'র বিষণ্ণভার বয়ে বেড়াল না, কোনদিন নিজের নিষ্ফল জীবনকে ধিক্কার দিল না।

এখনো সেই একই জিনিস কাজ করছে।

আমি নইলে ওদের ভালবাসার খেলা শুকনো মরুভূমিতে শুকিয়ে যেত। সেই প্রতিকূলতার মরুভূমিকে রমলা সরস করে দিয়েছে আপন হৃদয়-ঔদার্যে, এ আত্মতৃপ্তি কি সোজা!

আত্মপ্রেমী রমলার এই আত্মতৃপ্তি, এই সুখ!

রমলা ভেবেছিল, বাবা একদিন ক্ষেপল, পরদিন আর তাকিয়েও দেখবে না।

এটা ভুল ভেবেছিল।

কারণ বাবার সম্পর্কে সে অঙ্ক খাটতো যখন বাবার একটা কর্মজীবন ছিল। বাবা সেই 'জাহাজী' কারখানার মধ্যে নিমগ্ন থাকত, তাই ঘরে সংসারে কী ঘটছে না ঘটছে তাকিয়েও দেখত না। যেটা ওপর ওপর দেখত, তার প্রতি ওই ভাবই ছিল।

কিন্তু এখনকার কথা আলাদা।

এখন সত্যশরণের বেকার অবস্থা, তাই প্রাণের ভিতরটা সর্বদাই খাঁ খাঁ করছে। তার ওপর আবার চোখের সামনে শ্যামল ঘোষালের ধাড়ি ধিঙ্গি মেয়েটা যদি এ বাড়িতে এসে এ-ঘর ও-ঘর ঘুরঘুর করে, তাহলে মেজাজ নরম রাখা সোজা নয়।

আবার একদিন ওই দৃশ্যটি চোখে পড়ল তাঁর।

শ্যামল ঘোষালের মেয়েটা টুক করে এসেই তাঁর লক্কা ছেলেটির ঘরে ঢুকে পড়লো। মেয়েটার হাতে দুটো বই খাতা ছিল বটে। কিন্তু ও তো ভেক্।

সত্যশরণ রাগে ফুঁসতে লাগল।

সত্যশরণ মেয়েটাকে কিছু বলতে পারল না, নিজের ছেলেকেও না।

সত্যশরণ প্রতীক্ষা করতে থাকল কতক্ষণে নিজের মেয়েকে হাতের কাছে পাবে। কতক্ষণে ওই পাজী ছুঁড়িটা বিদেয় হবে।

একসময় দেখলো ছুঁড়িটা বিদেয় হল, সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটাও বেরিয়ে গেল।

এটা আরো গাত্রদাহকর।

বাছাধন কি ওকে বাড়ি পৌঁছে দিতে গেলেন?

যাক্, বেরিয়ে গেছে এ একটা শান্তি।

সত্যশরণ রমলার কাছে এসে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল।

রমলি, খোকা এ সময় কোথায় গেল?

রমলা ভেবেছিল বাবা কোথায় না কোথায়, নয়নার আসা টের পায়নি, এখন বুঝল বিলক্ষণ টের পেয়েছে বাবা। গলার স্বরেই মালুম।

রমলা মনে মনে শক্ত হল।

ভয় খেলে চলবে না।

আর ওই ব্যাপারটা যে দোষণীয়, এমন ভেবে দেখলেও চলবে না।

রমলা অবহেলার গলায় বলল, 'তা হঠাৎ আমিই বা জানব কী করে বাবা। তুমিও যেখানে আমিও সেখানে।

সত্যশরণ ভিতরে মেয়েকে ভয় করলেও মুখে বরাবরই টন্‌কো।

সত্যশরণ সেই টন্‌কো সুরে বলে, তুমি মর্তে থাকলে স্বর্গ পাতাল সব দেখতে পাও। তোমার সঙ্গে আমার তুলনা! শুনি কোথায় গেল?

রমলা বুঝল বাবা এখন ঝগড়ায় নেমেছে।

রমলা অতএব আরো হালকা গলায় বলল, বোধ হয় বিলেতে।

সত্যশরণ ক্ষেপে গেল।

বলল, বুঝেছি, জেনেশুনে ন্যাকা সাজছিস। বলি—ওই মেয়েটা ফের এল যে ?

রোজই তো আসে। বলল রমলা।

সত্যশরণ গুম্ হয়ে বলল, কী বললি ? রোজ আসে ?

বাঃ, তা আসবে না ? ওর এখন নতুন কলেজের পড়া—

তার মানে খোকা এখনো সেই পড়ানো চালাচ্ছে ?

চালাবে না—কী যে বল বাবা ! পড়াবে বলে কথা দিয়েছে !

কথা দিয়েছে ? পাড়ার একটা ধাড়ি মেয়েকে পড়াবে বলে কথা দিয়েছে ? বলি রমলি, এই কথা দেওয়ার সাহসটি তাকে কে দিয়েছে ? নিশ্চয় তুই ?

রমলা এ কথার সরাসরি জবাব এড়িয়ে গিয়ে বলে, কেন, তোমার ছেলের বুঝি সাহসের বড় অভাব ?

তাহলেও এত সাহস হত না, যদি তুই না আস্কারা দিতিস। বলি বাড়ির কর্তা কে ? তুই না আমি ?

রমলা এবার হালকা ভঙ্গী ত্যাগ করে গম্ভীর হয়। বলে, এটা তো জিজ্ঞেস করবার কথা নয় বাবা ! পৃথিবী জানে, পৃথিবীর আইন জানে কার কী ওজন।

বড় বড় কথা বলিস না রমলি, ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বলিসনি। বলছি আমি যখন বাড়ির কর্তা, তখন আমার মতে সংসার চলবে না কেন ?

কে বলছে চলবে না—রমলা আরো শক্ত হয়ে বলে। চালাও না।

ঠিক আছে। তবে এই বলে দিচ্ছি, ওর আসা বন্ধ করতে হবে। কাল বলে দিবি তুমি আর এসো না।

আমি বলতে পারব না।

পারবে না ? তুমি পারবে না ?

না। ভদ্দরলোকের মেয়েকে বলা যায়, তুই আর আসিস না !

বলা যায় না? তাহলে তো ভদ্দরলোকের মেয়ের জন্যে মাথাটা পেতে দিতে হয়—বলতে হয় এইখানে তুমি চরণ রেখে নেত্য কর মা জননী! কেমন?

জানি না বাবা। তোমার যত অনাছিষ্টি। তবে ওর বাপকেই বল গে।

আমি ওর বাপকে বলতে যাব? আর তুই ঘরে বসে ওই ধানি-লঙ্কার মতো মেয়েটাকে বলতে পারবি না—তোর আসা-টাসা বাবা পছন্দ করে না?

তাহলে বাপের নিন্দে রটে।

রটে তো রটে, সত্যশরণ বলে, সত্যশরণ ঘোষ নিন্দেকে থোড়াই কেয়ার করে, বুঝলি? বলে দিবি।

আমার দ্বারা হবে না।

বেশ ঠিক আছে, সত্যশরণ ফোঁস্ ফোঁস্ করে নিশ্বাস ফেলে, আমার বাপের ভিটেয় ওসব লভ্-টভ্ করতে দেব না। তা বলে দিচ্ছি।

রমলা হাসে। রমলা জানে বাবার যত তড়পানি বাড়িতে।

রমলা তাই নিশ্চিন্ত ছিল। কিন্তু তার সেই নিশ্চিন্ততায় মুগুর মারল বাবা। কিছুক্ষণ পরে কোথা থেকে যেন এসে বীরবিক্রমে বলে উঠল, দিয়ে এলাম একখানি কড়া রদ্দা।

পার্থ এ-সময় বাড়ি থাকে না, তাই সত্যশরণের গলা তারায় ওঠে, হুঁ বাবা, বাছাধনের একেবারে মুখ কয়লা হয়ে গেছে।

রমলা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। বাবা আবার কাকে রদ্দা মেরে এল! আর যাই হোক, মারধোর করার প্রকৃতি তো বাবার নয়। যা করে মুখেই।

বাবা ওর হতচকিত মুখ দেখে বেশ খোলা গলায় হেসে বলে, আরে, রদ্দা মানে কি আর সত্যি সত্যি হাতে-কলমে? মুখে মেরে এলাম। তা হাতের মারের থেকে মুখের মার অনেক জোরালো, বুঝলি?

রমলা বলে, কিন্তু কাকে মারলে?

তুই যে একেবারে আকাশ থেকে পড়লি রমলি, যেন সাতকাণ্ড রামায়ণ শুনে সীতা কার পিতা! ওই ধিঙ্গি মেয়েটার বাপকে শুনিয়ে এলাম, আবার কাকে? এমন শোনানো শুনিয়েছি যে আর এ-মুখো হতে হবে না হারামজাদীকে।

রমলা বাবার ওই উল্লসিত মুখের দিকে তাকিয়ে মাটিতেই বসে পড়ে। আর্তনাদের মতো বলে ওঠে, বাবা!

সত্যশরণ আরো জোরালো গলায় বলে, বাবা আবার কী? আমি কাউকে ভয় খাই নাকি? বিষগাছের চারা গোড়াতেই নির্মূল করতে হয়, বুঝলি?

রমলা শুকনো গলায় বলে, সত্যি তুমি ওদের বাড়ি গিয়ে বলে এলে ওই সব?

তার মানে? সত্যি না তো কি মিথ্যে? সত্যশরণ কখনো মিথ্যে বলে না।

কথাটা অবশ্য নিতান্তই মিথ্যা অহঙ্কার। মিথ্যা কথা সত্যশরণের মুখের আগাতেই থাকে। রমলার সেটা অজানাও নয়, কিন্তু এখন বাবার নাচানাচি দেখে মনে হচ্ছে, ওই রদ্দা দিয়ে আসাটা বোধ হয় নেহাৎ মিথ্যা নয়।

রমলা স্তব্ধ হয়ে যায় এরপর কী করে মুখ দেখাবে নয়নাদের কাছে? কেন মরতে রমলা বাবাকে বলেছিল, আমার দ্বারা হবে না? তুমি বল গে না? স্বপ্নেও ভাবেনি বাবা সেটা সত্যি ঘটিয়ে ছাড়বে। ইস্! রমলা কেন বাবাকে স্তোক দিয়ে বলল না, আচ্ছা বলে দেব!

রমলা পাংশু মুখ করে বলল, গিয়ে কী বললে তুমি?

সত্যশরণ দেখল জেরার মুখে পড়ে যাচ্ছে, তাই এবার না চেঁচিয়ে গমগমিয়ে বলল, আমি তো খাতা কলম নিয়ে যাইনি যে তোকে নিখুঁত বিবরণ দিতে বসব, আমি কি বললাম, ও কি বলল, ও কি বলল, আমি কি বললাম! রাগের মাথায় ঝেড়ে বলেছি, ব্যস। ব্যাটার মুখ স্রেফ কাঠকয়লা। বলল, ঠিক আছে। তবে মা-টি সোজা নয়, বেশ

জাঁহাবাজ। বৈঠকখানা ঘরে এসে আমার মুখের ওপর বলে কিনা, আমার মেয়ে যদি বৌ হয়ে আপনার ঘরে ঢোকে, আটকাতে পারবেন? —তামাশা করল, বুঝলি? এই একটা বুড়ো লোকের মুখের ওপর তামাশা করল। আমিও ছেড়ে কথা কইনি, বলে এসেছি, আচ্ছা আচ্ছা, আটকাতে পারি কি না দেখিয়ে দেব।

রমলার আর কিছু বলার ক্ষমতা থাকে না। বাবা যা করে এসেছে, তা সে বুঝতে পারছে। কিন্তু একটা কথা সে বুঝতে পারেনি, বাবা মিথ্যে কথা না কইলেও বিরাট একটি সত্য গোপন করেছে।

* * *

নয়নার বাবা বলেছিল, ঠিক আছে, যাবে না। কিন্তু এমন প্রতিশ্রুতি তো দেয়নি, ঠিক আছে আপনার ছেলের সঙ্গে মিশবে না!

অতএব ওটা থাকে। রাস্তায় ঘাটে রেস্তোরাঁয়। নয়নার মা আক্রোশ নিয়েই মেয়েকে এগিয়ে দেয় বুড়োর নাকে ঝামা ঘষতে। অবশ্য নয়নার বাপকে লুকিয়ে। লোকটা বহু ধান্ধায় বাইরে ঘোরে। অসুবিধে হয় না।

ওখান থেকেই পার্থ সব সংবাদ সংগ্রহ করে ফেলেছে, এবং তার মুখও কয়লার মতো হয়ে আছে।

প্রথম দিনই নয়না রাস্তায় ধরল পার্থকে।

বলল, কথা আছে।

নয়নার মুখ থমথমে লাল।

নয়নার চোখে ঘৃণা উপচে পড়ছে।

পার্থকে পার্কে ডেকে নিয়ে গিয়ে ঘটনাটা ব্যক্ত করে বলল, দেখলে? বলিনি আমি?

পার্থ বলল, তোমার বোধ হয় কোথাও ভুল হচ্ছে নয়না!

ভুল হচ্ছে? কিশোরী নয়না, আহ্লাদী নয়না, তীক্ষ্ণ যুবতীর তিক্ত মুখে বলল, ভুল আমার হচ্ছে না, হয়ওনি কোনদিন, তুমিই মায়া-কাজল পরে বসেছিলে। নইলে অত উদারতা, অত ইচ্ছে

করে করে তোমাকে আমাকে ঠেলে ঠেলে একসঙ্গে বেড়াতে পাঠিয়ে দেওয়া, ইচ্ছে করে আমাকে তোমার কাছে পড়তে আনা, এগুলোকে তুমি স্বাভাবিক বলে মনে করতে পারতে ?

হঠাৎ পার্থর যেন দৃষ্টি খুলে যায়।

সত্যিই তো, এগুলো কি স্বাভাবিক !

এমনিতে তো দিদির প্রথম দিকের মনোভঙ্গী দেখেছে পার্থ। নয়নাকে দেখলেই ভুরু কুঁচকে ওঠা, সারাক্ষণ পাহারা দেওয়া, আরো এটা-সেটা বিরক্তি ভাব, হঠাৎ একদিন পার্থ একটু শরণাগতের ভূমিকা নেওয়া মাত্রই আকাশের মতো উদার হয়ে গেল দিদি, এটা বিশ্বাসযোগ্য ? অথচ বিশ্বাস করেছে পার্থ।

বিশ্বাস করেছে, আর নিজের বুদ্ধিমত্তায় উৎফুল্ল হয়েছে। ভেবেছে কী একখানা চাল চেলেছি। রোজই ভেবেছে আমি চাল চালছি।

অথচ তার অনেক ওপরে চাল দিচ্ছিলেন রমলা নামের সরল সাদা মহিলাটি।

উঃ, ভাবা যায় না !

রাগে অশ্রদ্ধায় বিদ্বেষে সারা শরীর রি রি করতে থাকে পার্থর। সেটা এত বেশী হয় আরো নিজে অপদস্থ হয়ে গিয়ে।

নিজের বুদ্ধির ওপর প্রভূত আস্থা নিয়ে চিরকাল দিদিকে ম্যানেজ করার আত্মপ্রসাদ অনুভব করেছে সে, এবং দিদিটাকে হাবাগোবা ভেবে করুণাই করে এসেছে। বুদ্ধির লড়াইয়ে দিদির কাছে পরাজিত হল পার্থ নামের অতি বুদ্ধিমান ছেলেটা ! ছি ছি !

তার ওপর আবার সেই পরাজয় ধরা পড়ল কিনা নয়নার মতো আর এক তুচ্ছবুদ্ধি মেয়ের কাছে ? নয়নার দৃষ্টিতে গোড়া থেকেই প্রকৃত তথ্য ধরা পড়েছে। পার্থই চোখে রঙিন চশমা পরে বসে থেকেছে। সাবধান বাণীতে কান দেয়নি।

এই পরাজয়ের লজ্জাই পার্থকে আরও ক্ষিপ্ত করে তোলে।

এখন সে দিদির চিরদিনের ব্যবহারের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করতে

বসে এবং অনেক জায়গাতেই অভিসন্ধির আভাস পায়।

দিদির সমস্ত আচরণের মধ্যেই পলিসি আবিষ্কার করে ফেলতে থাকে পার্থ।

ওদিকে নয়নার মার কাছে মাথা হেঁট।

তিনিও যাচ্ছেতাই করে বলেছেন, এতখানি অপমান জীবনে হইনি পার্থ, অকারণ এ অপমান আমি সইবো না। তোমার বাবার মুখের ওপর বড়মুখ করে যে-কথা বলেছিলাম সে-কথা কাজে পরিণত করতে হবে, এই আমার সাফ্ কথা।…নয়নাকে আমি আর তোমার সঙ্গে মিশতে না দিতে পারতাম, কিন্তু তাহলে তো যারা ষড়যন্ত্র করেছে তারা আড়ালে হাসবে। ভাববে আমরা ভয় খেয়েছি।

তা সেই চিন্তাই পার্থকেও বেপরোয়া করে তুলতে চাইছে। যেন ওরা মনে না করে 'বাছাধন ভয় পেয়ে গেছে।' না ভাবে, 'আচ্ছা টিট করে দিয়েছি।' ওরা মানে—দিদি আর বাবা।

নইলে নয়না সম্পর্কে সেই মধুর রসের ভাবটি আর খুঁজে পাচ্ছে না পার্থ। এখন দেখা যাচ্ছে এ মেয়েও ঝুনো মেয়ে। এবং ওর মায়ের ভাবভঙ্গীও আদৌ নরম নয়।

পার্থর যেন মনে হয় যে এদের কবলে পড়ে গেছে। আর সেই পড়ে যাওয়ার জন্যে দায়ী ওই দিদি।

পার্থ প্রেম করছিল কি গোল্লায় যাচ্ছিল তাতে তোমার কী? তুমি তার মধ্যে নাক গলাতে এলে কেন? পার্থর বয়েস হয়নি?

মা-মরা ভাইকে কবে তুমি একটু মানুষ করেছিলে, সেই দাবিতে চিরদিন তাকে কিনে রাখবে?

যদি হঠাৎ ধাক্কায় মনের মোড় ঘুরে যায়! বুঝি এইভাবেই যায়। তখন অভিযোগের পর অভিযোগের ঢেউ এসে ভাসিয়ে নিয়ে যায় অতীতের সব ভাল, সব স্মৃতি, সব ভালবাসা।

অতএব পার্থর মুখও কয়লার মতো হয়ে থাকবে এতে আর বিচিত্র কী!

রমলার চোখ এড়ায় না, কিন্তু রমলা সবটা জানে না, তবু রমলার তাই তেমন সাহস হয় না বাবার সেদিনের অভিযানের কাহিনী ভাইয়ের কাছে গল্প করতে। কি জানি, কতটুকু শুনেছে, রমলা আবার কতখানি বলে বসবে!

খড়ের গাদায় আগুন লাগলে ভেতরে ভেতরে তুষ হতে থাকে, তারপর হঠাৎ সামান্য উপলক্ষে জ্বলে ওঠে। পার্থও তুষ হচ্ছিল, জ্বলে উঠল একদিন।

সত্যশরণ তদবধিই ছেলের মুখের দিকে আড়ে আড়ে দেখে, কথাবার্তা বলে না। ছেলের সঙ্গে সরাসরি কথা তার দৈবাতের ঘটনা, সবই দেয়ালকে শুনিয়ে অথবা রমলার মাধ্যমে। আজ হঠাৎ মুখোমুখি দাঁড়াল। কোথা থেকে যেন ফিরে বিষম চিৎকারে ডাক দিল, রমলি, সেই বাপের কুপুত্তুরটা ফিরেছে?

রমলা প্রমাদ গনল। সাবধানে বলে, এইমাত্র ফিরেছে। কেন, কী হয়েছে?

দরকার আমার তাকেই, তোকে বলবার দরকার নেই, সেই কুলাঙ্গারকেই বলছি, এই খোকা, হারামজাদা ছেলে, নেমে আয় বলছি।

রমলা বাপের এমন মূর্তি জীবনে দেখেনি। ভয় পেয়ে বলে, বাবা, চেঁচিও না, তোমার প্রেসার বেড়ে যাবে।

সত্যশরণ তেমনি ভাবেই বলে, বাড়ুক, মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাক, আজ আমি একটা এস্পার-ওস্পার করে ছাড়ব। প্রেসার আমার এতে বাড়বে, আর ওই নচ্ছার ছেলের বদমাইশীতে বাড়বে না?

রমলা বাপকে ধরে জোর করে বসাতে গেল, পেরে উঠল না।

পার্থ নেমে এল। পরিস্থিতির দিকে একটা অবজ্ঞার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলল, হয়েছেটা কী?

হয়েছেটা কী? জানো না তুমি? বলি এতর পরও তুই ওই ধিঙ্গি লক্ষ্মীছাড়া মেয়েটাকে নিয়ে বায়োস্কোপ যাসনি? তারপর দুজনে

রঙ্গে মেতে ইস্টিমার চড়ে গঙ্গায় বেড়াতে যাসনি ?

পার্থ তীব্র দৃষ্টিতে একবার দিদির দিকে তাকিয়ে বাবাকে বলে, কোন্ মেয়েটা, তা না বললে বুঝব কী করে ?

বুঝবে না ? পাজী শয়তান ছেলে ! ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানো না তুমি, কেমন ? ওই শ্যামল ঘোষালের মেয়ে, নয়নাবতী ! ওকে নিয়ে বেড়াতে যাসনি তুই ?

যাব না কেন ? পার্থ বলে, রোজই যাই।

রোজই যাস ? নিজে মুখে বললি আমার মুখের ওপর ! এত আস্পদ্দা ! বলি পরের দস্যি মেয়েকে নিয়ে কেন যাস তুই বেড়াতে, গঙ্গার হাওয়া খেতে ?

রমলা সেখান থেকে চলে যাচ্ছে না কেন ? রমলা একেবারে বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছে কেন বাবার পিঠের কাছে ? বাবা পাছে পড়ে যায় সেই ভয়ে ? নাকি পার্থ কেন ওর দিকে অমন ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে, সেই বিস্ময়ে ?

পার্থ সমান জলন্ত ঘৃণার দৃষ্টিতে দুজনের দিকেই তাকিয়ে বলে, যাই, ওকে আমি বিয়ে করব বলে।

রমলা বাঁচল। রমলা ভাবল জোঁকের মুখে নুন পড়ল। বাবা এবার থমকে যাবে। কিন্তু তা হল না, সত্যশরণের তখন সত্যিই প্রেসার চড়ে উঠেছে।

সত্যশরণ রগের শির ফুলিয়ে বলে, কী বললি ! ওকে বিয়ে করবি ? ওই বেহায়া মেয়েটাকে ? বিয়ের আগে যে পরপুরুষের সঙ্গে ছক্কা-পঞ্জা করে বেড়ায় ?

বাবা ! পার্থ কঠোর গলায় বলে, আমি আপনাকে বলে দিয়েছি ওকে আমি বিয়ে করব, ওর সম্পর্কে ভদ্র ভাবে কথা বলবেন।

অ্যাঁ, কী বললি ? সত্যশরণের সর্বাঙ্গ কাঁপতে থাকে, বেরিয়ে যা আমার বাড়ি থেকে, বেরিয়ে যা। এক্ষুনি এক কাপড়ে বেরিয়ে যা, তোকে যদি আমি ত্যাজ্যপুত্তুর না করি তো—

রমলা চেঁচিয়ে ওঠে, বাবা ! কাকে কি বলছ ? রাগের মাথায়

কাণ্ডজ্ঞান হারাচ্ছ? পরে যা বিবেচনা হয়—

কিন্তু সত্যশরণ ওসব ভবিষ্যতের জন্যে রাখতে রাজী নয়। সত্যশরণ তার কথা শেষ করে, ত্যাজ্যপুত্তুর না করি তো আমি বাপের কুপুত্তুর। দেখগে যা, তেজ্য করলে ওই ঘোষালটা কেমন তোর হাতে মেয়ে দেয়। ভেবেছে টাকার কুমীর বুড়োর সব টাকা ওর মেয়ের হবে, তাই বামুন হয়ে কায়েতের ঘর—আর তুই মুখ্যু ওই টোপ গিলে—বেরিয়ে যা—বেরিয়ে যা—

যাচ্ছি। বলল পার্থ, এগিয়ে গেল দরজার দিকে।

ব্যাকুল রমলা চেঁচিয়ে ওঠে, বাবা, দেখতে পাচ্ছ কী সর্বনাশ করছ তুমি, ডাক ওকে। পার্থ, দেখতে পাচ্ছিস বাবা এখন সজ্ঞানে নেই, এই ছ্যাখ কাঁপছে, পড়ে যাবে হয়তো। যাসনি ভাই, আমার মাথা খা—

হঠাৎ উদ্যত পা ফিরিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে পার্থ ব্যঙ্গ হাসি হেসে বলে, থাক্ দিদি, সারাজীবন অনেক অভিনয় করেছ, আর থাক। তোমার স্বরূপ বোঝা গেছে। এখন বুঝতে পারছি একটা মাত্র ছেলে হয়েও কেন আমি চিরকাল বাবার বিষ নজরে পড়ে আছি।

রমলার মুখের উপর কি কেউ ছেঁড়া জুতো ছুঁড়ে মারল? আর রমলা সেই আকস্মিকতায় রাগতেও ভুলে গেল? শুধু বিহ্বলের মতো বলল, এখন বুঝতে পারছিস? আমার স্বরূপ বোঝা হয়ে গেছে তোর?

গেছে বৈকি। চিরকাল কি আর ধাপ্পা চলে? ঠিক আছে, যার জন্যে সারাজীবন আমাকে বাবার চু'চক্ষের বিষ করে বাবার সুয়ো হয়েছিস, তাই হোক তোর।

পার্থ! আমি—আমি—আমি বাবার সুয়ো হয়ে—

হয়েছে দিদি হয়েছে, মাপ কর, দয়া করে আর জাল বিস্তার কোরো না। আমি ওই ঘুষের টাকা ঘৃণা করি।

সত্যশরণ ঝিমিয়ে বসে পড়েছিল, আবার হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে, কী বললি, ঘুষের টাকা? রমলি, ও এখনো এ বাড়ির চৌকাঠের মধ্যে কেন?

অবশ্য ততক্ষণে আসামী চৌকাঠের বাইরে চলে গেছে। আর

এতক্ষণের সেনাপতি তার সমস্ত বীরত্বের ভঙ্গী ত্যাগ করে কেমন যেন বোকার মতো একটু তাকিয়ে থেকে নড়বড় করতে করতে রণক্ষেত্র থেকে চলে যায় শিবিরে।

আগাগোড়া ব্যাপারটাই নাটকীয়। যেন পুরো একটা নাটকের সীন। অভিনয়ের শেষে যবনিকাও পড়ে গেল, শুধু নায়িকা বসে রইল বোকার মতো। বুঝতে পারল না ব্যাপারটা কী ঘটেছে। বুঝতে চেষ্টা করবারও ক্ষমতা রইল না। আর তারপর? বোঝবার সময়ও রইল না।

অতি উত্তেজনায় স্ট্রোক হয়ে স্রেফ একটা দিক প্যারালিসিস হয়ে বিছানায় পড়ে রইল সত্যশরণ। রমলা আর কখন ভাববে তখন কী ঘটেছিল? রমলা আর কখন চেষ্টা করবে পার্থ নামের সেই রগচটা ছেলেটাকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনবার? জিজ্ঞেস করবার, ব্যাপারটা কী আমায় বুঝিয়ে বল্ তো পার্থ?

কোথায় যে আছে সে তাই তো জানা যাচ্ছে না। বাবার এই অসুখের কথাটা জানতে পারলেও কি আসত না সে?

সত্যিই তো, মানুষ বই পশু নয়। কিন্তু কে জানাবে?

এদিকে সত্যশরণ ডাক্তারকে বলে, মরণ-ঘণ্টা তো বেজেছে ডাক্তার, আর ছুঁচ বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে পৃথিবীতে দু'দিন বেশী টিকিয়ে রাখবার কী দরকার? তোমার সেই উকিল ভাইটাকে একদিন নিয়ে এস দিকি। শেষ-মেষ একটা ব্যবস্থা করে যাই।

মাথা খোঁড়ে রমলা বাবার পায়ে ধরে, আমায় চির-অপরাধী করে রেখো না তার কাছে, তাকে বঞ্চিত করার উইল করো না।

কিন্তু সত্যশরণ বদ্ধপরিকর। সত্যশরণ বলে, বাম অঙ্গটা পড়ে গেছে এটা মন্দের ভাল, ডানটা গেলে সই-সাবুদ হত না। কোন্‌দিন ওটাও যায়! ডাক্তার, তোমার ওপর দায় দিচ্ছি।

অবশেষে রমলা স্থির করে, ঠিক আছে, এরপর তো আমারই হাতে। ও না নেয়, ওর বৌকে দানপত্র করে দেব। রমলা তাই থেমে যায়।

সত্যশরণের 'হা রমলি জো রমলি'র অবস্থা বাড়তেই থাকে। তাই তার কাছে বশ্যতা স্বীকার না করে পারে না রমলা। রমলাকে চক্ষে হারায় সত্যশরণ। রমলা না খাইয়ে দিলে খাবে না, রমলা পা টিপে না দিলে, রমলা চান না করিয়ে দিলে তার চোখ দিয়ে জল পড়ে।

নীলকণ্ঠকে ধারে-কাছে আসতে দেয় না। সে জলের কুঁজোটা ভরে রাখতে এলে চেঁচায় সত্যশরণ, তুই এই ঘরে কেন? দিদিমণি কোথায়?

নীলকণ্ঠ আড়ালে বলে, বুড়োর সর্বদাই ভয় কে কখন ঘুন্‌সি থেকে চাবি খুলে নিয়ে ওকে ফাঁক করে।

মরণ-ঘণ্টা যে বেজে এসেছে সে কথা সবাই বুঝতে পারে। রমলা বলে, বাবা, তুমি ওকে ক্ষমা করে যাও।

সত্যশরণ তখনো মরা হাতী লাখ টাকা। বলে, কাকে ক্ষমা করব রে রমলি? দেয়ালকে? বলি সে একবার এসে দাঁড়িয়েছে? বাপ মৃত্যুশয্যায় বলে একটু অনুতাপ করেছে?

কথাটা সত্যি। সে আসেওনি, অনুতাপও করেনি। প্রথম প্রথম রমলা খবরটবর সংগ্রহ করতে পারেইনি সত্যি। খবর দিতেও পারেনি। কিন্তু ক্রমশ? পেয়েছে আর দিয়েওছে। নীলকণ্ঠই সরবরাহ করেছে খবর।

নয়নার এক মাসির বাড়িতে গিয়ে বিয়ে হয়েছে নয়নার পার্থর সঙ্গে, আর সেখানেই মাসির বাড়ির একখানা ঘর ভাড়া করে আছে। খুব কষ্ট।

তারপর মহোৎসাহে বলেছে, বলেছি বাবুর খুব অসুখ, বাবু বোধ করি আর বাঁচবে না। দিদিমণি বলেছে একবার দেখতে যেতে। তা ওই নয়না দিদিমণি বলে কি, 'বাবু কি বলেছেন যেতে?' তা মিছে কথা তো কইতে পারি না যে বলব হ্যাঁ? তাছাড়া—এলে যদি বাবু এই মারে সেই মারে করে?

সে ভয় রমলারও আছে, কিন্তু রমলা ভাবে, সারাজীবনই তো মার খেয়েছিস পার্থ তোর ডক্‌বাবুর কাছে, শেষকালেও নয় একবার খা। কিন্তু এলে তো ?

তবে কি রমলা নিজেই যাবে ? গিয়ে হাত জোড় করে বলবে, পার্থ, তোর কাছে আমি যা যা দোষ করেছি আমায় শাস্তি দিস, এতবড় শাস্তির বোঝা চিরদিনের জন্যে নিজের জন্যে সঞ্চয় করিস না। আর এ-কথাও বলে আসবে, পার্থ, তুই সেদিন বুঝতে পারিসনি, লোকটা যা বলেছে, রোগেই বলেছে। ওর তখন প্রেসার বেড়ে গেছে তুরন্ত বেগে।

বাবা যখন পঙ্গু হয়ে পড়ল, প্রথম প্রথম রমলা ভাইকে মনে মনে খুব ধিক্কার দিয়েছে, ভেবেছে দেখা হলে বলবে, তুই—তুইই বাবার মৃত্যুর কারণ।

কিন্তু তারপর—সব রহস্য ফাঁস হয়ে গেছে। অন্তরাল থেকেই হয়েছে। নীলকণ্ঠ এবং ঝি তুজনেই দাদাবাবুর বাড়ি যাতায়াত করছে যখন-তখন। ঝি তো আবার বাসন-টাসনও মেজে দিয়ে আসে অসুবিধে দেখলে। নীলকণ্ঠ বাজার করে দিয়ে আসে।

কারণ নয়না দিদিমনি তাদের ডেকে বসায়, চা খাওয়ায়, বসে গল্প করে। যেটা রমলার ধাতে নেই। তা নইলে রমলাই কি বসে জিজ্ঞেস করতে পারত না, কী দেখলি ? কেমন সংসার করছে ? রাঁধতে পারে নয়না ?

না, রমলা জিজ্ঞেস করে না। ওরা এসে কথা তুললে বলে, গিয়েছিলি বেশ করেছিলি, ভাল আছে তো ?

হঠাৎ হঠাৎ একদিন যখন সত্যশরণ ঘুমোয়-টুমোয়, অবাক হয়ে ভাবে রমলা, কী আশ্চর্য, পার্থর বিয়ে হয়ে গেছে, পার্থ বৌ নিয়ে সংসার করছে, অথচ রমলার সেখানে কোন ভূমিকা নেই !

রমলা প্রায় জীবনভোরই পার্থর বিয়ের কথা ভেবে শিল্পকর্ম করে আসছে, ছুঁচের কাজ করা বড় বেডকভার, বালিশ-ঢাকা, মশারির সাটিনের ঝালর, জানলা-দরজার নানাবিধ পর্দা, সায়ার লেস,

ব্লাউজপীসে চুমকির কাজ, অবসর মানেই একটা সেলাই নিয়ে বসা রমলার রোগ। সে রোগের একমাত্র লক্ষ্য ছিল পার্থর বৌ, পার্থর বিয়ে, পার্থর বিয়ের তত্ত্ব সাজানো। সেই তত্ত্বের সমারোহের মধ্যে রমলার হাতের কাজ যাবে ধন্যি ধন্যি কুড়োতে, রমলা বলবে, এতদিনে সব সার্থক।

তার ওপর একটা ধাক্কা এসে পড়েছিল নয়নার ব্যাপারে। পাশের বাড়ির মেয়ে, অন্য জাতি, অবশ্যই বাবার সঙ্গে সংঘর্ষ করতে হবে। বাবা কি আর তেমন করে ঘটা করবে? তবু রমলা নয়নার গায়ের গড়নের দিকে তাকিয়ে দেখে নিয়ে চুপি চুপি পশমের ব্লাউজ বুনে বুনে জমা করেছে গোটা চার-পাঁচ।

বাবাকে ম্যানেজ করে নেবেই, এ বিশ্বাস ছিল। কিন্তু হঠাৎ একটা ঝড় তুলে সব ধ্বংস করে দিল বাবা। নিজেও ধ্বংস হল।

আর রমলাকে? সেও তো করেছে চক্ষুলজ্জার বশে। হ্যাঁ, চক্ষুলজ্জার বশেই। রমলা বাবাকে জানে মুখে যতই তড়পাক, ভিতরে নার্ভাস। তাই সেদিন শ্যামল ঘোষালের বাড়িতে যা কিছু বলে এসেছে, মেয়ের বকলমে বলেছে।

বলেছে, মেয়ে বলছিল আপনার ওই মেয়ের চালচলন ভাল নয়, বারণ করলে কথা শোনে না, ওর ভাইয়ের পড়া-লেখা নষ্ট করতে কেবল তার ঘরে গিয়ে ঢোকে। তা এসব তো ভাল কথা নয় মশাই! এদিকে অন্দরে অন্দরে তো ভাব-সাব, আপনার ওয়াইফের মুখের ওপর তো বলতেও পারে না, আপনার মেয়ে যেন আমাদের বাড়ি না যায়! তাই আমাকে মিনতি করে পাঠাল, বাবা, বৈঠকখানা ঘরে বলে এস, নয়ন যেন আর আমাদের বাড়ি না আসে। ওকে তো আর সত্যি তুমি বৌ করে ঘরে তুলতে পারবে না!

তারপর অবশ্য হয়েছিল বেশ কিছু বচসা। এবং সত্যশরণ তাতে বেশ কিছু ভূমিকা নিয়েছিল। কিন্তু প্রথম পাপী তো রমলা। রমলা 'মিনতি করে না পাঠালে' তো এসবের কিছুই ঘটত না। রমলাই তো রায় দিয়েছিল, ওকে তো আর সত্যি তোমার ঘরের

বৌ করে ঘরে তুলতে পারবে না ?

এসব রমলা শুনেছে একদিনে নয়, একজনের কাছেও নয়, আস্তে আস্তে কয়েকজনের কাছে। তার মধ্যে নয়নার মা-ও একজন। যিনি ছাদে দাঁড়িয়ে বাতাসকে কথা শোনান। তাছাড়া আছে ওই নীলকণ্ঠ, আর ধূর্ত ঝি-টি।

রমলা আর ভাইকে দোষ দেয় না। রমলা মনে মনে বলে, আমিও যদি এই অবস্থায় পড়তাম, করতাম না কি সন্দেহ ? আর সারা জীবনের সমস্ত ঘটনাগুলোর নতুন ব্যাখ্যা করতাম না কি ?

একটা জড়পিণ্ডের মতো গড়িয়ে পড়ে থাকা বাবার দিকে তাকিয়ে দেখে রমলা কি খুব মমতা অনুভব করে ? বোধ হয় করে না। আপন নিরুপায়তার হিসেবটাই করতে বসে। মুক্তি নেই। মুক্তি নেই রমলার। এই জড় পদার্থটার মুক্তির আগে রমলার মুক্তি নেই।

আবার যখন বাবা মা-রমলা মা-রমলা করে, তখন একেবারে মায়া আসে না তা নয়। যে মমতা শ্রদ্ধা প্রীতি স্নেহ থেকে উদ্ভূত নয়, নিতান্তই মানবিকতা থেকে উদ্ভূত।

কী করবে ? লোকটা যে একেবারেই শ্রদ্ধার যোগ্য নয়। তার উপর আবার এই এক উৎপাত—দানপত্র। রমলাকে আরো হেয় করতে।

ডাক্তারবাবু তার উকিল ভাইকে ডেকে এনে পরামর্শ চালালেন সারা সন্ধ্যা, তারপর—তাহলে ওই কথাই রইল বলে চলে গেলেন।

রমলা শেষ চেষ্টা করতে গেল। বলল, বাবা, উইলটা কী ভাবে—

সত্যশরণ হঠাৎ ক্ষেপে উঠল, বলল, কেন ? সেকথা শুনে তোমার কী হবে ? তোমার ইচ্ছেয় উইল বদলাবো ? আমি সেই হারামজাদাকে একটি পাইপয়সা দেব না, ব্যস।

রমলা বলে, অতএব তোমার সমস্ত পয়সার বোঝা আমার গলায় চাপিয়ে যাবে ? ওসব চলবে না বাবা। পার্থকে ডাকিয়ে তুমি মাফ করে ঘরের বৌ ঘরে তোল।

সত্যশরণ পাশ ফিরতে পারে না। তাই কড়ি-বরগার দিকে চোখ রেখে বলে, তোমার কথায় চলব না কি আমি ?

আমি যদি তোমার সম্পত্তি না নিই ?

নিও না, বয়ে গেল। রাস্তায় ফেলে দিও।

অনমনীয় সত্যশরণকে নমনীয় করা যায় না।

শেষ পর্যন্ত একদিন ওদের কাছে যাবারই সঙ্কল্প করল রমলা। বাবাকে বলা চলবে না, মুমূর্ষু রোগীটার কাছে মিথ্যে কথাই বলতে হবে। উপায় কি !

এইসব ঘটনা ঘটে যাবে, বাবা মারা যাবে, পার্থ আর কোনদিন এ ভিটেয় পা দেবে না, রমলা যক্ষীর মতো আগলে বসে থাকবে ? এ কখনো হতে দেওয়া যায় ? এইবেলা মিটিয়ে ফেলতে না পারলে পরে কি আর পার্থ দিদির দান কড়ে আঙুলেও ছোঁবে ? বলবে না তুমিই আমার এই সর্বনাশটির কারণ ?

এখন কি আর রমলা গিয়ে সাফাই গাইতে পারবে, আমি সেদিনের ব্যাপারে বিন্দু-বিসর্গও জানি না রে পার্থ ! সব বাবার চালাকি !

ওরা মুখের ওপর হেসে উঠবে না ? পার্থ সেই ঘৃণার দৃষ্টিতে বিঁধে বলবে না, কী দিদি, আবার একটা গল্প বানিয়ে এলি কোন্ মতলবে ?

তবু যাবে রমলা। একবার পার্থকে না দেখে যেন থাকতে পারছে না সে। কত দিনরাত পার হয়ে গেল, পার্থর পায়ের শব্দ শুনতে পায়নি রমলা, 'কতদিন পার্থ আয়, খেয়ে উদ্ধার করে যা' বলে ডাকেনি। কতদিন ছাদে কাপড় তুলতে গিয়ে সেই শৌখিন শৌখিন জামা-পায়জামাগুলো তোলেনি।

পার্থর ঘরের দরজায় তালা ঝুলছে, পার্থর ছ'জোড়া জুতোয় ছাতা ধরছে। পার্থর আলমারী বোঝাই জামা-প্যাণ্ট আর কোনদিন নেবে না পার্থ, এই কথা যখন ভাবে রমলা, ধৈর্য রাখতে পারে না। ভাবে মান অপমান এই দুটো বস্তুর মূল্য কী ? পার্থ যদি আমায়

আরও একবার অপমান করে, করুক। বলব, পার্থ, তুই আমায় মার ধর, তবু এলাম। তোকে একবার না দেখে আর থাকতে পারছি না।

সেই মতলবে বাবার কাছে গিয়ে বলল, কাল আমি কালীঘাটে একজন জ্যোতিষীর কাছে যাব বাবা!

বাবা মুখ বিকৃত করে বলল, কেন? বাবা কবে মরবে তাই জানতে? অঙ্গেই পক্ষাঘাত, মস্তিষ্কে কিছু না। সেখানে আগের মতই সব।

তা আমার সম্পর্কে যখন তোমার এত উচ্চ ধারণা, ধরে নাও তাই।

আর তাই যদি না হয়, বাবা মুখটা আরো বিকৃত করে বলে, এখন কি আবার মাদুলী-কবচ করে বাবাকে বাঁচাতে হবে?

অনেক ইচ্ছে হলেও রমলা বাবার মুখের ওপর নিষ্ঠুর হতে পারে না, আজ হল। বলে উঠল, তোমার জন্যে আর ভাবাভাবির কী আছে বাবা? যাচ্ছি নিজের ভবিষ্যৎ ভাগ্য জানতে।

সত্যশরণ হঠাৎ চমকে ওঠে। মেয়ের মুখে এ রকম কথা তো জীবনে শোনেনি সে? রমলাকে দেখলে তো কোনদিনই মনে হত না রমলার একটা অতীত ছিল, আর রমলার একটা ভবিষ্যৎও থাকলে থাকতে পারে!

না, রমলা ওসব নিয়ে কোনদিন মাথা ঘামায় না, রমলা যেন শুধু বর্তমানের। তাই সত্যশরণ চমকে উঠে বলে, কেন, হঠাৎ ভবিষ্যৎ-ভাগ্য নিয়ে মাথা ঘামছে কেন? নতুন কী হল? আমি তো মরিনি এখনো।

কিছুই না। এমনি।

সত্যশরণ গোঁ গোঁ করে বলে, আর আমার পিণ্ডির ব্যবস্থাটি কী হবে?

রমলা বলে, নীলকণ্ঠকে বলে রেখেছি।

নীলকণ্ঠর হাতে খাব আমি?

কেন, কী হবে ? ও তো ময়রার ছেলে। ওর হাতে দোকান থেকে খাবার আনিয়ে খাই না আমরা ? তাছাড়া কথাতেই আছে 'আতুরে নিয়ম নাস্তি'। হাসপাতালে যেতে হলে তো রুগীকে হাড়ীবাগ্দীর হাতেও খেতে হয় বাবা !

সত্যশরণ যেন মেয়ের এই নিষ্ঠুরতায় মরমে মরে যায়, তাই অভিমানের গলায় বলে, বেশ, তাই দিস, বুড়ো বাপটা যখন এতই গলগ্রহ, হাসপাতালেই দিস।

রমলার মায়া হয়। রমলা নরম গলায় বলে, কেন মন খারাপ করছ বাবা, বেশী দেরি হবে না।

তবু শুনি ?

এই ঘণ্টা তিন-চার।

ঘণ্টা তিন-চার ! সত্যশরণ চোখে সর্ষেফুল দেখে। অতটা সময়ের মধ্যে নীলকণ্ঠ তার কোমরের ঘুনসি থেকে যাবি খুলে সর্বস্ব ফাঁক করে নিয়ে চলে যেতে পারে না ? সত্যশরণ বাধা দিতে পারবে ? মুখটা বেঁধে দিলে চেঁচাতে পারবে ?

সত্যশরণ হাহাকার করে ওঠে, এতক্ষণ একা থাকব আমি ?

কালীঘাটের দূরত্ব এবং নিজের কার্যকলাপ সম্বন্ধে চিন্তা করে ওই সময়টা হাতে নিয়েছিল রমলা। নইলে পার্থর মাসশাশুড়ীর বাড়ি তো বেশী দূর নয়। আর অভ্যর্থনা বুঝে থাকা।

বাপের কথায় বকে ওঠে রমলা—দিনের বেলা আবার একা কী বাবা ! আমি যাচ্ছি।

ঠিকানাটা আবার ভাল করে দেখে নিয়ে একটা রিকশা গাড়ি চেপে বেরিয়ে পড়ে রমলা। রিহার্সাল দিতে দিতে যাবে ভাবে। কিন্তু পথে বেরিয়ে রমলা হঠাৎ ভাবে, কালীঘাটের নামে মিথ্যা কথা বললাম ! যদিও পূজো দিতে যাচ্ছি এই কথাটা স্পষ্ট করে বলিনি, তবু বাবা তো তাই ভাবল।

সারাজীবন তো সংসারের চাকাতেই ঘুরপাক খেলাম। ঠাকুর দেবতা, মন্দির পূজো, এসব কিছুই করলাম না কখনও, অথচ

আমি বিধবা মানুষ! ঠিক আছে, আগে সেখানেই যাই। রিকশাওলাকে প্রশ্ন করল, সে মহোৎসাহে বলল, কেন পারব না। তিন টাকা লাগবে।

ঠিক আছে, যা লাগবে, খুব জলদি ফিরিয়ে আনবি।

জায়গাটা অপরিচিত, সঙ্গে কেউ নেই। রমলা খুব স্বস্তি বোধ করল না।

যেমন-তেমন করে বাবার নামে একটু পূজোও দিল। তারপর নয়নার মাসির বাড়ির ঠিকানাটা বলে দিয়ে যেন স্থির হয়ে বসল।

পূজোর প্রসাদ নিয়ে ঢুকব, মারবে কি আর? আজ রবিবার, পার্থ নিশ্চয়ই বাড়ি আছে। অবশ্য জানে না, পার্থ কিছু কাজকর্ম করে কিনা। কিছু কি না করলে চলছে? মানী ছেলে, সে কি আর শ্বশুরবাড়ির ভাতের ওপর থাকবে?

অনেক কিছু ভাবল রমলা পথটুকুতে, শুধু একটা কথা ভাবল না। সেটা গিয়ে জানতে পারল। পার্থরা বাড়ি নেই।

এটা ভাবেনি রমলা। ভেবেছিল রবিবারেই সুবিধে, পার্থ থাকবে। ভাবা উচিত ছিল রবিবারে হয়তো ওরা নয়নাদের বাড়িতে নেমন্তন্নে আসতেও পারে।

রমলা কি তবে নয়নাদের বাড়িতেও ঢুকে দেখবে? মাথা যখন হেঁট করেছে, শেষ অবধিই করবে।···ভাবল—পারল না। অতটা পেরে উঠল না। নিজেদের বাড়ির দিকেই চলে এল।

আর ঢোকার মুখে রিক্শা থেকেই রমলা দেখতে পেল দরজায় একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে। তার মানে ডাক্তারবাবুর সেই উকিল ভাই আবার কোন ছুতো করে এসেছে। আসে আর ট্যাক্সি ভাড়া নেয়। ওর বেলায় বাবার কার্পণ্য নেই।

রমলা রিক্শার পয়সা মিটিয়ে প্রসাদ হাতে নিয়ে ধীরেসুস্থে বাড়ি ঢুকল। সিঁড়ি দিয়ে উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে যেন বিদ্যুতের চাবুক খেল।

বাবার ঘরে কার গলা! কে কথা বলছে বাবার সঙ্গে! রমলার

শরীর অবশ হয়ে এল। প্রসাদটা মাথায় ঠেকাল। মা-কালী তাহলে সত্যিই এত জাগ্রত! পূজো দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মতিবুদ্ধি ভাল হয়ে গেছে ওর!

হুট করে কি ঘরে ঢোকা যায় এ-রকম পরিস্থিতিতে? পা টিপে টিপে আঁচল থেকে চাবির গোছা নিয়ে পার্থর ঘরের তালাটা খুলে দিল। তারপর তেমনি পা টিপে টিপে বাবার ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল। আর একমুহূর্তে ঘরের লোক তিনটে যেন ভূত দেখে পাথর হয়ে গেল।

তুমি!

একমুহূর্তই, পরমুহূর্তেই সত্যশরণ চেঁচিয়ে উঠল, এই যে, এলে এতক্ষণে! অথচ এরা তোমার জন্যে কখন থেকে—

ওই উদ্দাম আবহাওয়ার ওপর একটি শান্তকণ্ঠ যেন বরফজল ঢালল।—আমরা তো ওঁর জন্যে আসিনি বাবা, আপনি ডেকেছিলেন তাই এসেছি।

ডেকেছিলেন! সত্যশরণ ডেকেছিলেন ওদের! কখন! কাকে দিয়ে! রমলার এই অনুপস্থিতিটুকুর মধ্যে এমন কী ঘটল! সত্যশরণ যে ঠিক মুখাগ্নির মুখে, তাও তো মনে হচ্ছে না! কাছেই টেবিলে চায়ের শূন্য পেয়ালা ও জলখাবারের শূন্য ডিস অন্য সাক্ষ্য দিচ্ছে।

রমলা বাবার মুখের দিকে তাকাতেও পারল না। রমলা শুধু বাবার সামনে বসা ওই মাথায় আঁচল দেওয়া ঢাকাই শাড়ি পরা মেয়েটার দিকে তাকিয়ে দেখল। মেয়েটার গলায় একখানা চওড়া পাটিহার জমজম করছে। এ হারটাকে চেনে রমলা, অণু-পরমাণুতে চেনে। মরবার দু'দিন আগে মা খুলে দিয়ে বলেছিল, মড়ার গলা থেকে খুলে নেওয়া জিনিস অপয়া হবে, এখন থেকে দিয়ে রাখলাম রমলা, আমার পার্থর বৌয়ের জন্যে রেখে দিস। ওই কিপ্‌টে হয়তো প্রাণ ধরে দেবে না, তুই বলিস, মা বলে গেছে।

তা এতে অবাক হবার কি আছে! মার শেষ ইচ্ছে বাবা যদি

এতদিন মনে রেখে শেষ অবধি পালন করে থাকে, বাবাকে তো হৃদয়বানই বলতে হবে।

পার্থ জানলার ধারে দাঁড়িয়েছিল, পার্থর পিঠটাই শুধু দেখা যাচ্ছিল। রমলার মনে হল পিঠের গড়ন মানুষের এমন অনমনীয় হতে পারে!

বাবা ওই বরফ-জলটার ঘায়ে কিঞ্চিৎ ঠাণ্ডা মেরে গিয়েছিল, আবার উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে বলে, তা তো ঠিক, না ডাকলেই বা আসবে কেন তোমরা? তোমাদেরও তো একটা মান-অভিমান আছে। তা রমলি, তুইও রাতদিন ঘ্যানঘ্যান করতিস না, ওদের ক্ষমা করে দাও বাবা, ওদের ক্ষমা করে দাও বাবা, তা দিলাম ক্ষমা করে। মরণের দরজায় পা দিয়েছি, তেজ অহঙ্কার রেখে আর কী হবে? তবে তুইও বলেছিস, তা মনে রাখিস।

মনে রাখব—রমলা শান্তভাবে বলে, কিন্তু তুমি একটা কথা মনে রাখনি বাবা, আমি যে তোমাকে বরাবর বলে এসেছি, আমার গয়নাগুলো সমস্ত পার্থর বৌকে মুখ দেখে দেব। কই, সেগুলো তো বার করনি?

নয়না একবার অপ্রতিভ গলায় বলে, বাঃ, আপনারগুলো কেন?

তা আমি তো তোর বড় ননদ, নাকি রে? মুখ দেখে সোনা দেব না? আগে তো বলেও রেখেছিলাম, মনে তো তোরও নেই।

নয়না মাথা নিচু করে। সত্যিই বলত রমলা। 'তোকে দেব' একথা অবিশ্যি বলেনি। বলেছে আমার সব গয়না পার্থর বৌকে দেব। আমার শ্বশুরঠাকুরটি তো আমার কেপ্পন বাবার কাছ থেকে কম আদায় করেনি? অনেক আছে।

পার্থর পিছন দিকটাই যেন কিছু একটা বলতে চায়, বলে না। শুধু বক্তা সত্যশরণই বলে ওঠে, একখানা দেবে দাও, সবগুলো দেবে কেন? কথায় বলে, সময়ের আভরণ, অসময়ের পেট ভরণ। সোনা কি সব হাতছাড়া করতে আছে?

রমলা হঠাৎ বেশ খোলা গলায় হেসে ওঠে, আমার আবার পেট

ভরণের চিন্তা কি বাবা ? আমি তো রাজার মেয়ে। কই, চাবিটা একবার ঘুন্‌সি থেকে খোল দিকি, আমি নিজেই বার করে দিই।

সত্যশরণ সহসা রীতিমত বিরক্ত গলায় বলে, তুই বড় ব্যস্তবাগীশ রমলা, ওরা তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। একবার যখন এসেছে, তখন আসবেই আবার। কিছু না হোক শ্বশুর মরলে ছেরাদ্দতেও আসবে। এখন থাক্, ওদের দেরি হয়ে যাচ্ছে।

রমলা কি নিবৃত্ত হয় ? হয় না। রমলার মাথায় যেন জেদের ভূত চাপে। রমলা বলে, তোমার শ্রাদ্ধের কালে আমি বৌকে সোনা দিয়ে মুখ দেখতে যাব বাবা! না, চাবিটা দাও তুমি, আজ এসেছে ওরা প্রথম, আজই দেব।

অতএব দিতেই হয়। ওই জেদী মেয়ের কাছে তো চিরদিনই হার স্বীকার সত্যশরণের। কিন্তু দুরন্ত ব্যাধিগ্রস্ত ওই লোকটা যদি গিঁট পড়ে যাওয়া ঘুন্‌সিটা না খুলতে পারে, যদি তার হাত কাঁপে, সে সাহায্য চাইবে না অন্য লোকের ? অতএব সত্যশরণ যদি কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে ওঠে, দ্যাখ্ তো খোকা, কী রকম জড়িয়ে গেল! তোর দিদির যেমন, আয় তো ইদিকে।

পার্থও মৃত্যুপথযাত্রী বাপের অনুরোধটা বোধ হয় ঠেলতে পারে না, তাই কাছে এসে বলে, কই, কী হল ?

এই যে মাদুলীর সঙ্গে আটকে গেছে। পারছি না। হাত কাঁপে তো!

কিন্তু পার্থর তো আর হাত কাঁপে না, তাই পার্থ অতি সহজেই চাবিটা ঘুন্‌সি-মুক্ত করে। একটু আগেই তো একবার করেছে। সত্যশরণ যেন নতুন করে তাড়াতাড়ি বলে, ওই যে ওই দেয়ালে গাঁথা আলমারিটা, দু'বার ডাইনে মোড় দিয়ে একবার বাঁয়ে মোড় দিবি, তবে খুলবে।

বাঁয়ে মোড় আর ডাইনে মোড়, দু'বার আর একবার। এ তো একটা সাঙ্কেতিক ব্যাপার। এতে এত হাসি পাবার কী আছে ? তবু রমলা হেসেই মরে। বলে, ডাইনে মোড়, বাঁয়ে মোড়—হি হি!

আ মোলো, হাসছিস কেন? সত্যশরণ বলে, ছাখ্ তো, তোরগুলো বোধ হয় নিচের ড্রয়ারে আছে, দেখে কী দিবি দে।

রমলা হাসতে হাসতে বলে, সব সব। তুই নিজেই বার করে বৌকে সাজিয়ে দে না পার্থ, আমি দেখি।

কিন্তু দেখা পর্যন্ত অপেক্ষাও করে না রমলা, হাসতে হাসতেই ঘর থেকে বেরিয়ে আসে মুখে আঁচলটা গুঁজে দিয়ে।

সত্যশরণ সেই দিকে তাকিয়ে বলে, তোমায় কী বলব খোকা, হিংসেটা ওর বরাবরই বেশী। তাই তোমাকে কোনদিন আমার কাছে আসতে দেয়নি। ওর জন্যে বাপ কখনও ছেলে পেল না। সত্যশরণের চোখ দিয়ে একটু জলও গড়িয়ে পড়ে। রুগী মানুষ তো। আবেগটা সইতে পারে না।

চাবিটা খুলে পার্থ বলে, কী করব, বন্ধ করে দিই?

দে। ধেই ধেই করে চলেই তো গেল। যা হবে পরে হবে। ঢঙ দেখিয়ে বললো দেব। এখন বোধ হয় মন সায় দিচ্ছে না।

চাবিটা আবার সাঙ্কেতিক নিয়মে বন্ধ করে পার্থ, তারপর কাছে এসে বাবার দিকে চাবিটা এগিয়ে দেয়।

বাবার বাঁ হাতটা অসাড়, কিন্তু ডান হাতটায় তো সাড় আছে, বাড়াতে তো পারে! কিন্তু বাড়ায় না সত্যশরণ নামের চিরকৃপণ লোকটা। একটু উদাস উদাস গলায় বলে, আর ও জঞ্জাল নিয়ে আমি কী করব বাবা! সেখানে তো নিয়ে যেতে পারব না! ও তোমার কাছেই রাখ।

পার্থর মুখটা লাল হয়ে ওঠে। পার্থ বলে, আমি রাখতে যাব কেন?

তুমি ছাড়া আর কে রাখবে বল? তুমিই তো সব। আর এই তো দেখছ অবস্থা, কত সময় এরকম একা পড়ে থাকতে হয়। অবিশ্যি দোষ আমি দিচ্ছি না তোমার দিদির, করছে সাধ্যমত, তবে শুধু আমায় নিয়ে পড়ে থাকলে তো চলে না! এই এখনই দেখলে তো? এল তাড়াতাড়ি নইলে বলেছিল তো চার-পাঁচ ঘণ্টা হবে।

চাকর ব্যাটা তো যখন-তখন ঘরে ঢুকছে, যদি জোর করে চাবি কেড়ে নিয়ে চোখের সামনে সর্বস্ব বার করে নিয়ে হাওয়া হয়ে যায়, কিছু করতে পারবে তোর বাবা ?

হঠাৎ কেঁদে ওঠে সত্যশরণ, নিজের সেই অসহায় অবস্থার কথা ভেবেই হয়তো।

আমরা যাই। বললো পার্থ।

যাবে ? আজকের মতো এস তবে।

সত্যশরণ কাঁদো-কাঁদো গলাতেই বলে, ভেবেছিলাম, অনেকক্ষণের জন্যে বেরিয়ে গেল, তোদের সঙ্গে নিরিবিলিতে একটু—তা এক্ষুণি হয়ে গেল কালীঘাট যাওয়া, বাপের জন্যে পূজো দেওয়া। ভগবান জানে কোনরকম খবর পেয়েই ছুটে চলে এল কিনা। ওই পদ্মর মা! ওটি হচ্ছে দু-মুখো সাপ। তোমাদেরও ডেকে এনেছে, ওকেও লাগিয়েছে।

এর আর লাগালাগির কি ?

পার্থ বলে গম্ভীরভাবে, তুমি কি এতোদিন ওঁর ভয়ে ডাকোনি ?

ভয়ে ?

সত্যশরণ পারলে লাফিয়ে উঠত।

পারল না তাই শুধু গলার স্বরটাই তার লাফায়, ওর ভয়ে ? আমি করবো ওকে ভয় ? ও আমার গুরুদেবী ? না মনিব ? আমি তোদের ডাকতে পারিনি বাবা নিজের কৃতকর্মের লজ্জায়। মাথার ঠিক ছিল না, বুঝলি ? মাথার ঠিক ছিল না। প্রেসারটা চড়চড় করে বেড়ে উঠেছিল। তা দেখলি তো সেই অপরাধের শাস্তিও কম পেলাম না। এ জন্মেই শাস্তি শোধ হয়ে গেল আমার।

পার্থ বাবার বাকভঙ্গীতে চিরদিনই অভ্যস্ত, তবু আজ পার্থ মনে করে এই লোকটাকে অকারণেই সে চিরদিন হেনস্থা করেছে। অতটা করা উচিত হয়নি। আসলে তার চোখের সামনে একটা পর্দা পড়েছিল।

পার্থ তাই কোমল গলায় বলে, ওকথা বলছো কেন ? তোমার

এই অবস্থা, আমাদের তো আসাই উচিত ছিল, আসতে চেষ্টাও করেছি, তোমার বিরক্তির ভয়েই—

সত্যশরণ হঠাৎ হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল।

স্থির হোন, চুপ করুন বাবা।

নয়না কাছে এসে দাঁড়ায়। তারপর শ্বশুরের পঙ্গু পায়ে একটু হাতের ছোঁওয়া দিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে বেরিয়ে আসে।

পিছন পিছন পার্থও। চাবিটা তার পকেটেই থেকে যায়।

সত্যশরণ গলা নামিয়েও প্রায় চেঁচিয়ে ডেকে বলে, শোন, চাবিটা সাবধানে রেখো, যেন পড়ে-টড়ে না যায়।

রমলা নীচের তলায় কী যেন করছিল।

ওদের নামতে দেখে থমকে দাঁড়াল। স্থির গলায় বলল, তোরা চলে যাচ্ছিস?

পার্থ কিছু বলল না, নয়না মোলায়েম গলায় বলল, উনুনে আগুন দিয়ে এসেছি, হঠাৎ ডেকে পাঠালেন—

ও! আমি এখানে তোদের জন্যে—

থেমে গেল।

এও বলতে পারলো না আমি তোদের কাছে গিয়েছিলাম।

বলল, পার্থ, তোর জামা-জুতোগুলো সব এখানে রয়ে গেল—

পার্থ এবার মুখ ফিরিয়ে একটু তীক্ষ্ণ হাসি হেসে বলল, শুধু জামা-জুতো?

বেরিয়ে গেল।

রমলা নিষ্পলক তাকিয়ে থাকলো।

সত্যিই তো কী বোকার মতো কথাটা বলে বসলো সে! শুধুই জামা-জুতো!

ঠিক হয়েছে, মুখের মতো জবাব পেয়েছে।

কিন্তু জীবনে কখনো আমি ধৈর্য হারালাম না, বিচলিত হলাম না, আর এই চরম পরীক্ষার মুহূর্তেই ফেল করলাম?

ভাবল রমলা, কেন আমি অমন পাগলের মতো চলে এলাম বাবার ঘর থেকে?

কত সুন্দর কত মহিমান্বিত হত, যদি দাঁড়িয়ে থেকে আমার সব গয়নাগুলো বার করিয়ে নয়নাকে পরিয়ে দিয়ে খোলা গলায় বলতে পারতাম, দেখ বাবা, কেমন মানিয়েছে। বলতে পারতাম, পড়ে পড়ে পচে যাচ্ছিল জিনিসগুলো। ওরাও হাওয়ায় বেরিয়ে বাঁচলো।

তারপর জোর করে ওদের ধরে রেখে মাছ-ভাত খাইয়ে দিত। সহজভাবে বলত, আর চলে যাবি কেন রে? বাবার এই শেষ কটা দিন—

কিছুই হল না। কিছুই হল না।

রমলা পাগলের মতো ছুটে বেরিয়ে এল।

কিন্তু ওদের সামনে ডুকরে কেঁদে উঠলেই কি মানমর্যাদা বজায় থাকত রমলার?

ভাবতে ভাবতে আস্তে আস্তে সমস্ত পৃথিবীটা যেন আশ্চর্য একটা শান্ত আর স্থির হয়ে ধরা দিল রমলার চোখের সামনে।

রমলার অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সব একরঙা দেখাচ্ছে।

ধূসর সাদাটে ঘষা কাঁচের মতো।

বৃষ্টিহীন মেঘলা দুপুরের মতো।

রমলা নিজেও ওইরকম হয়ে গেল।

ওরা চলে গেলে রমলা এসে ঘরে ঢোকে বাবার ডাবের জল নিয়ে। শান্তভাবে বলে, বাবা, ডাব খেয়ে নাও।

বাবা আড়চোখে দেখে পরম স্বস্তি পায়, রাগ-অভিমান কিছুরই চিহ্ন নেই সেখানে। তার মানে অবস্থা বুঝে সমঝে গেছে। যাক—প্রকৃত অবস্থাটা টের পায়নি। ঢকঢক করে খেয়ে নেয় কাত হয়ে। একটু হৃষ্টচিত্তে বলে, ডাবটা ভাল। যেমন মিষ্টি তেমনি জল।

হ্যাঁ, নীলকণ্ঠ ডাবটা আনে ভাল। আচ্ছা বাবা—

সত্যশরণ চকিত হল। এইবার নির্ঘাত মেয়ে তাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে। তাকে না জানিয়ে ওদের ডাকার কৈফিয়ৎ চাইবে। গম্ভীর হয়ে বলল, কী ?

বলছিলাম কি আমার যে একটা শ্বশুরবাড়ি ছিল, তার ঠিকানাটা তোমার মনে আছে ? মনে থাকবার কথা নয়, তবে যদি বিয়ের পত্তর কি পত্ত-টত্ত থাকে। তোমার কাছে তো থাকে অনেক পুরনো জিনিস-টিনিস—

সত্যশরণের চোখের তারায় হঠাৎ আগুন জ্বলে ওঠে, বলে, তা এখন আবার মরণকালে জ্বরচ্ছেদ কেন ? কী হবে সে ঠিকানা ? যাবি নাকি ?

যাব বলেই তো বলছি বাবা, আর জ্বর তো মরণকালেই ছেদ হয়।

সত্যশরণ এবার হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে, তুই চলে যাবি ? এই পঙ্গু অসহায় বাপটাকে ফেলে রেখে দিয়ে চলে যেতে পারবি তুই ? এই জন্যে এত আদরযত্নে মানমর্যাদা দিয়ে এতদিন পুষলাম তোকে আমি ?

রমলা দিব্যি হেসে হেসে বলে, দুধকলা দিয়ে কালসাপ পুষেছ বাবা ! যা জগতের রীতি ! জানো না মেয়ে-সন্তান পরস্য পর ?

সত্যশরণ উত্তেজনার চোটে উঠে বসতে যায়, তারপর বলে, তার মানে ওদের দেখে নুনের নৌকো ডুবে গেছে তোমার ! তবে বলি, তোমায় তো আমি একেবারে বঞ্চিত করিনি—এই বাড়িতে তোমার জীবনস্বত্ব আছে।

এতদিনের এত সাবধান এত গোপন কথাবার্তা হঠাৎ নিজেই ভেস্তে ফেলে সত্যশরণ।

বলেই চমকে যায়।

জীবনস্বত্ব ! রমলাও যেন হোঁচট খায়, ও বাবা ! তার মানেটা কি গো বাবা ?

সত্যশরণ বেজার গলায় বলে, মানে যেন তুমি জানো না ? যতদিন জীবদ্দশা ততদিন যেমন গিন্নী হয়ে আছ থাকবে, কেউ তোমায়

নড়াতে পারবে না। আর নগদ পাঁচ হাজার টাকাও রইল তোমার নামে, যদি তীর্থ-ধর্ম করতে ইচ্ছে হয়। সত্যশরণ সবটা একসঙ্গে বলে ফেলে যেন বাঁচে। প্রকাশ যখন হয়েই গেছে, একঘায়েই কোপ হয়ে যাক।

কিন্তু ভবি যে ভোলবার নয়। তাই রমলা বলে, তবে তো কথাই নেই। সবই ঠিক রইল, কিন্তু আমি বলি কি, তুমি থাকতেই একবার না হয় ঘুরে আসি। এর পর হয়তো তারা আমায় চিনতেই পারবে না, হুট আউট করে দেবে। বলবে, কোথায় তোমার সেই বাবা, যার মেয়েকে নিয়েছিলাম আমরা? তাছাড়া যদি বলে বসে, এতদিন যে তুমি বাপের কাছেই ছিলে তার প্রমাণ কি? তখন? তুমি তবু সাক্ষীটা দিতে পারবে।

সত্যশরণ বোঝে মেয়ের সংকল্প অটুট, কারণ মেয়েকে তো জানে সে। তবু শেষ চেষ্টা করে, এমন কথা বলবে?

কেন বলবে না বাবা? মানুষে বলতে পারে না এমন কথা মানুষের ভাষায় আছে?

সত্যশরণ কথাটার মর্মার্থ বোঝে না। আবারও বলে, তা—যেখানে প্রমাণ দাখিল করে যেতে হবে ভাবছিস, তেমন ছোটলোকের বাড়িতে যাবি তুই?

রমলা অম্লান বদনে বলে, পৃথিবীটা তো ছোটলোকেরই বাবা, ও নিয়ে আর খুঁতখুঁত করে কী হবে? কালই চলে যাই।

কালকেই যাওয়ার কথা বলেছিল রমলা, কিন্তু হল না। তার ভাগ্যটা খারাপ। এতদিন নয় ততদিন নয়, সেইদিনই মারা গেল বাবা, সিনেমা-থিয়েটারের গল্পের মতো। যদিও ওরই মধ্যে অনেক লড়ালড়ি করতে হয়েছিল রমলাকে।

বাবা বলল, আমাকে যদি এখনই এই মুমূর্ষু কালে একা ফেলে চলে যাস, তোর ধর্মে সইবে না রমলি!

রমলি অম্লান বদনে বলল, একা কেন বাবা, পার্থরা চলে আসুক।

নয়না খুব কাজের মেয়ে।

কাজের মেয়ে তো মাথা কিনবে! ও রোগীর সেবার জানে কি?

ঘাড়ে পড়লেই শিখে যাবে।

তবু তুই এই দণ্ডে যাবি? এইভাবে এতদিনের ঋণশোধ করবি? এত নুনের নৌকো ডুবলো তোর যে এই পঙ্গু বুড়োর মরা পর্যন্তও অপেক্ষা করতে পারছিস না?

তুমি থাকতে থাকতেই যে যাব বাবা।

আর আমি যদি আজই মরে যাই?

বলল জেদের মাথায়, আর কিনা তাই হয়ে বসলো!

ওসব কথা ছাড়। এভাবে বুড়ো বাপকে জব্দ করলে ধর্মে সইবে না রমলি।

রমলা বলল, ধর্ম জিনিসটা কী, আর তার সওয়া-না-সওয়া কী, একবার দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে বাবা!

চলে গেলে আমার মরামুখ দেখবি।

সে তো না গেলেও দেখতে হবে বাবা। বরং প্রত্যক্ষ দেখতে হবে।

তোর মরা মায়ের দিব্যি রমলি, আমাকে সে তোর হাতে দিয়ে গেছে।

কী যে বল বাবা! তখন তোমার কত শক্তি সামর্থ্য তেজ, তোমাকে আবার কারুর হাতে দেবে কি? বরং মা আমাকেই তোমার হাতে দিয়ে গেছে। ভেবে দেখ মার শেষ কথাগুলো!

কথাটা ভুল নয়। সত্যশরণের মনে না থাকুক, রমলার মা মরণকালে স্বামীকে বলেছিল, রমলি রইল, ওকে দেখো। বাবা দেখেনি একথা কি বলা যায়?

তবু রমলা বাবাকে অসহায় রেখে চলে যাবার তাল করছে। সাধে কি আর বলে মেয়ে-সন্তান! পরস্য পর হয় তারা। যে শুনবে সে-ই ধিক ধিক করবে, কিন্তু রমলা নাকি ওসব গায়ে মাখে না। যে মেয়েমানুষ নিন্দে গায়ে মাখে না, তার আবার আছে কি? ছি ছি!

পার্থকে ডেকে আনতে গেল নীলকণ্ঠ। বললো, দেখুন দাদাবাবু, দিদিমণি চলে যাচ্ছে।

পার্থ স্তব্ধ হয়ে তাকাল, দিদিমণি চলে যাচ্ছে! কোথায়?

কে জানে, তেনার শ্বশুরবাড়ি না কি—

রমলার শ্বশুরবাড়ি! শব্দটার মানে ভাবতে চেষ্টা করলো পার্থ। তারপর বললো।

কে নিয়ে যাবে? কার সঙ্গে যাবে?

তা জানি না, যা হুকুম হবে!

বাবা কিছু বললেন না?

বাবু তো মাথা খুঁড়ে ফেলছে। কিন্তু কোন নড়চড় নেই। যেন বাবুকেই জব্দ করবার তাল।

রমলার নাকি বাবাকে জব্দ করার তাল ছিল, কিন্তু বাবাই জব্দ করল রমলাকে। বাবা থাকতে রমলা যেন চলে না যায় এ অনুরোধ রাখতেই হল রমলাকে। তবে বাবা ঝুলিয়ে রাখেনি ওকে। সেই রাত্রেই ছুটি দিয়ে গেল। সিনেমা-থিয়েটারের গল্পের মত প্রায়। বাবা দু'বার হেঁচকি তুলল, আর মরল।

খবর পেয়ে পার্থরা এল। আসবেই তো, এলও।

রমলা কিন্তু কোনরকম উল্টোপাল্টা ব্যবহার করল না। যা কিছু করতে হয় করল। চতুর্থী করল, ব্রাহ্মণ-ভোজন করাল। আর এই কথাবার্তা কাজ-কর্মের মাঝখানে আবার যেন পুরনো সহজ সুরটা ফিরে পেল পার্থ আর নয়না। দিদি যে এই সহজটা হল তাতে যেন বাঁচল ওরা।

একবার সেই শুনেছিল দিদি নাকি তার শ্বশুরবাড়ি চলে যাবে! কই, আর বলে না। যাবে কি? মাথা খারাপ? সেটা বাবার সঙ্গে ঝগড়ার ফল। কোথায় সেই শ্বশুরবাড়ি—সেখানে কেউ আছে কি না জানা নেই; দূর!

বাবার এই আকস্মিক মৃত্যুটা যেন পার্থর কাছে আশীর্বাদের মতই এল। নইলে কি জানি ঝগড়া করে চলেই যেত কিনা দিদি। দিদিহীন এই বাড়িটা ভাবাই যায় না। এর তিনতলা থেকে একতলা পর্যন্ত দিদি মাখানো। কত জিনিস, কতরকম কাজ তার, কে করবে বাবা সে-সব ?

এই যে বাবার শ্রাদ্ধে সিন্দুক থেকে বড় বড় বাসন-টাসন বেরোল, দিদি না থাকলে তোলা হত সে-সব ? নাকি পাড়াই হত ? পাগল ! পাড়ার ডেকরেটারের দোকান থেকে ভাড়া করে এনে কাজ সারা হত। শ্রাদ্ধে কত যে কাণ্ডকারখানা জানেই তো না পার্থ ! অধ্যাপক বিদায়, পণ্ডিত বিদায়, কাঙালী বিদায়, কত আইটেম। দেখে দেখেই প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে।

তাছাড়া দিদি না থাকলে পার্থদের জীবনেই বা সুখ কোথায় ? মুক্তি কোথায় ? দেখেছে তো একা সংসারে—বেরুতে পায় না। তা সারাজীবন ওরা বেড়াতে যাবে না, সিনেমা যাবে না, কিছু করবে না ? বেরোতে হলেই ঘরে তালাচাবি লাগাও। আর নয়তো রাতদিন বুড়ীর কুলগাছ আগলাও। এরপর তো সমস্যা আরো বাড়বে, দু'জনের জায়গায় তিনজন হবে, কে দেখবে।

এই তো, এর মধ্যেই তো পার্থরা নেমন্তন্ন করতে বেরোল ক'দিন, ফিরে এসেই খাবারের থালাটি হাতে পেল না ? নানাবিধ কাটা ফল, ছানা ক্ষীর দই ! অত ঘুরে এসে পারত নয়না অত সব গোছাতে ?

অবিশ্যি ছেলের বৌ শ্রাদ্ধের নেমন্তন্ন করতে যায় না, কিন্তু নয়না গেছে একটা কারণে। নয়না স্বীকৃতি আদায় করতে বেরিয়েছিল। আত্মীয়স্বজন জ্ঞাতিগোত্র জানুক পার্থর একটা বৌ আছে। আইন-সঙ্গত বৌ।

সব কাজ যখন মিটে গেছে, মিষ্টি-টিষ্টির বাসি রসগুলো পর্যন্ত বোঁদে বানিয়ে উঠিয়ে দিয়েছে রমলা, তখন একদিন, পার্থ তখন দাড়ি কামাচ্ছে, বৌ কাছে বসে আছে, রমলা এসে বলল, একদিনের জন্যে নীলকণ্ঠকে আমি নিয়ে যাচ্ছি, যাহোক করে একটু চালিয়ে নিতে

পারবি তো ?

ওরা আকাশ থেকে পড়ে, নীলকণ্ঠকে আবার কোথায় নিয়ে যাচ্ছ ?

কোথায় আর ! সেই জেদ, শ্বশুরবাড়ি যাবে রমলা । আশ্চর্য মেয়েমানুষ বটে !

কেমন চুপটি করে ছিল । শ্বশুরবাড়ি যাবে একথা কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি ।

পার্থ অগ্রাহ্যভরে বলে, সেই ভূত এখনো ঘাড় থেকে নামেনি তোর ?

কই আর নামল ? রমলা হাসে, ভূতে একবার ধরলে আর ছাড়ে না ।

বাঃ, তা তুই জানিস সে জায়গা কোথায় ? ঠিকানা কি তার ?

জানতাম না রে, হঠাৎ বাবার বাজে কাগজের ঝুড়ি থেকে আশ্চর্য রকম ভাবে পেয়ে গেলাম ।

তুই যাবিই ?

গেলামই বা বাবা । হিন্দুর মেয়ে, শ্বশুরের ভিটে-টিটে নাকি শুনেছি তীর্থ ।

কিন্তু দিদি, তুমি বৃথা অভিমান করছ, বাবার যদি বুড়ো বয়সে মতিভ্রম হয়ে থাকে, আমি কি করব ? আমি তো ভেবেছিলাম, আমাদের ওই মার স্মৃতিচিহ্ন দিয়েই বিদায় । তেজ্য ছেলে তেজ্য হয়ে থাকব । তারপর শুনি, বাবা আইনে ভয় খেয়েছে । এ-যুগের আইনে তো ছেলে-মেয়ে দুজনের বিষয়-সম্পত্তির সমান অধিকার, বাবা যদি আমায় দানপত্র করে না দিয়ে যায় তো তোর ওই শ্বশুরবাড়ির লোকেরা হয়তো এখানে এসে গেড়ে বসবে ।

এ রামো ! রামো ! ছেলেমানুষের মতো চেঁচিয়ে ওঠে রমলা, অন্য বাড়ির লোক এসে গেড়ে বসে থাকবে ! ছি ছি !

কিন্তু তুই কেন যেতে চাইছিস ? একবার আমি তোর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছিলাম সত্যি, কিন্তু তার কারণও ছিল । বাবা যে

বানিয়ে বানিয়ে তোর নাম করে ওদের কাছে বলেছে, তা তো জানতাম না। সেদিন বাবা দোষ স্বীকার করেছিল আমার কাছে।

দোষ স্বীকার করেছিল বাবা! রমলা একটু স্তব্ধ হয়ে গেল। কিন্তু দোষ স্বীকার করেছে ওদের কাছে, রমলার কাছে নয়। রমলার সামনে নয়। রমলা বলে, আরে আমি কি সেই কথা ভেবে বসে আছি?

তবে? তবে যাবার কী দরকার হচ্ছে?

ওসব বড় গোলমেলে ব্যাপার পার্থ, বুঝবি না।

কিন্তু তোমাকে এ বাড়ি থেকে ভাগাবার রাইট আমার নেই, তা তো জানো, তবে চলে যাবে কেন?

দেখ, ওই রাইট-ফাইট জিনিসগুলো বড় ঝঞ্ঝাটের, ও নিয়ে মাথা ঘামাস নে।

তার মানে তুমি আর কখনো আসবে না?

ও মা, সে কী! কেন? তোর ছেলেমেয়ের বিয়ে-টিয়েতে আসব না? অবিশ্যি তখন যদি নেমন্তন্ন করিস।

তারপর রমলা ছোট্ট একটা স্যুটকেস নিয়ে তার সেই চির-অজানা শ্বশুরবাড়ির উদ্দেশে যাত্রা করে।

পার্থ তখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে। সময় বুঝেই চলে গেছে। নয়না বলল, শুধু এইটুকু স্যুটকেস? আপনার জিনিসপত্তর?

আমার আবার জিনিস কি রে! দুখানা ধুতি, দুটো সায়া-ব্লাউজ —এই তো আমার জিনিস—

নয়না চুপ করে থাকে। নয়না দেখেছে দিদি নিরামিশাষী হলেও অন্য ব্যাপারে বেশ আড়ম্বরের সঙ্গেই থাকে। রমলা খারাপ বিছানায় শুতে পারে না, বাজে চা খেতে পারে না, দামী তেল-সাবান ছাড়া মাখে না।

নয়নাকে বলত, বিধবার এত সব আয়েস করতে নেই, কিন্তু আমি করি, বুঝলি? বিধবা বলে কি চোর-দায়ে ধরা পড়েছি নাকি?

নয়না বলে, একটা বিছানাও তো লাগবে ?

দূর ! লাগবে বললেই লাগে, লাগবে না বললে আর লাগে না !

অতএব ওই ছোট্ট সুটকেসটুকু নিয়েই পাড়ি দিল রমলা, ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই পোঁছে যাবে, নীলকণ্ঠ পৌঁছে দিয়েই ফিরে আসবে।

আশ্চর্য ! কত দিন মাস বছর পার করল রমলা, আর জীবনে এই তিন ঘণ্টার পথটুকু একবার পার হতে ইচ্ছে হয়নি তার ?

হয়নি সত্যিই। অন্ধের মত ভেবে এসেছে, একটা নিশ্চিন্ততার দুর্গে বাস করছি।

যখন আলোক নাহি রে

ছানি কাটিয়ে ভালো হবার বদলে চোখ দুটো একেবারে দৃষ্টি হারিয়েছে এই জন্যেই আদিনাথ নামের শক্তপোক্ত মজবুত স্বাস্থ্যের অধিকারী লোকটা স্রেফ অসহায় বনে গেছে। সাত বছরের নাতিটাই তার দেহরক্ষী। ছেলেটা এই সুযোগে মুরুব্বিয়ানা করতে ছাড়ে না, বলে, দাদু তুমি একলা কুয়োতলায় যাচ্ছো? থেমে দাঁড়াও আমি আগে হাত ধরি।

নয়তো বলে, দাদু তোমাকে নিয়ে আর পারা যাবে না, আমি ইস্কুল থেকে ফেরার আগেই বাগানে নেমেছো কেন?

আদিনাথ কখনো হাসেন, কখনো রেগেও ওঠেন। বলেন থাম্ থাম্, তোকে আর সর্দারী করতে হবে না। এ বাড়িতে আর হোঁচট খাচ্ছি না আমি, এর ইঁট কাঠ খোয়া খাপরা সব আমার মুখস্থ, বুঝলি?

ছেলেটা বলে, বাঃ, পায়ের কাছে যদি ঘটি থাকে কি মগ থাকে, দেখতে পাবে তুমি?

আদিনাথ গুম্ হয়ে যান। এ যুক্তির জবাব নেই তাঁর কাছে। সত্যি তো, থাকতেই পারে ওসব।

গমগম করে বলেন, হাত ধরেই নিয়ে চলো। তোমার হাতেই পড়েছি যখন। আর মন ভালো থাকলে আহ্লাদের গলায় ডাক দেন, অ বৌমা শোন তোমার ছেলের বাক্যি, বলে কিনা কেন তুমি একা বাগানে নেমেছ! আচ্ছা এক শাসনকর্তা দিয়েছ আমায়!

তবে মন ভাল থাকার ভাগই বেশী, কারণ স্বাস্থ্যের সঙ্গে মনের সম্পর্ক জোরালো, স্বাস্থ্যটা সত্যিই দেখবার মতো আদিনাথের, কে বলবে আশী বছর পার করে ফেলেছে লোকটা। তোয়াজও আছে শরীরের। সকালবেলাই মুঠোভর্তি ছোলা-ভিজে আর আদার কুচির সঙ্গে খানিকটা আখের গুড় খেয়ে তবে জলগ্রহণ। ওইটা খেয়ে বাড়ির উঠোনেই খানিকটা পায়চারি করে এসে বসেন দাওয়ায়

পাতা চেয়ারটায়। বসেই হাঁক পাড়েন, চা-টা হয়েছে নাকি বৌমা ?

বৌমা রান্নাঘর থেকেই বলে, হয়ে গেছে, নিয়ে যাচ্ছি।

এই চা-টির সঙ্গে টায়ের আয়োজনটি বেশ জোরালো হওয়া আবশ্যক, নইলে মনঃপূত হয় না আদিনাথের।

অতএব বৌমাকে এই সকালবেলাই ডেলি প্যাসেঞ্জার বরের টাইমের ভাতের সঙ্গে সঙ্গেই পাশে জনতা জ্বেলে বেগুনি ফুলুরি কি নিমকি ভাজতে হয়, তার সঙ্গে বেশ খানিকটা হালুয়া। হালুয়াটা প্রায়ই আটার হয়, সুজি এখানে দুর্লভ। আদিনাথ এটা না জানেন তা নয়, তবু খুঁতখুঁত করে বলেন, হালুয়াতে আর আগের মতো তার পাই না কেন বল তো বৌমা ? কেমন যেন চটচটে ল্যাবা-ল্যাবা।

শুনে যে বৌমার আপদমস্তক জ্বলে ওঠে এতে সন্দেহ নাস্তি। তবু সেই জ্বলুনির তাপ সামলেই বলে, সুজি তো এ হপ্তায় আসেনি বাবা !

আদিনাথ রেকাবির ওপর হাত বুলিয়ে বুলিয়ে সবটুকু শেষ করতে করতে বলেন, ঘিটা একটু বেশি দিয়ে কড়া করে ভেজে নিও দিকি আটাগুলো।

মাধুরী আর উত্তর দেয় না। এই একই ধরনের কথার কত আর উত্তর দেবে ?

এই সবের সঙ্গে মুড়িটা চাই-ই আদিনাথের, মুড়ি থাকেই ঘরে। সদু ময়রানী মুড়ি ভেজে ভেজে যোগান দিয়ে যায়। মুড়ি ভাজার ব্যবসা করে সদুবালা।

ভাজার পর কাঁখে টিন নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে সন্ধান নিয়ে বেড়ায় সে, মুড়ি লাগবে নাকি গো বৌদিদি ?

বৌদিদিই বেশী, কাকী পিসিও আছে কিছু কিছু। সদুকে মাধুরী তেমন দেখতে পারে না। বড্ড গালগল্প করে, সময় নষ্ট হয়। তাছাড়া অন্য বাড়িতে গিয়ে মাধুরীর সংসারকে বিস্তার করবে। ওই যখন স্বভাব।

অবিশ্যি মাধুরীর সংসারে নিন্দনীয় কিছুই নেই, ব্যাখানা করবার মতোও না। স্বামী শ্বশুর আর একটা ছেলে এই নিয়ে তো সংসার

তার। বিয়ে হয়ে এসে পর্যন্তই গিন্নী হতে হয়েছে তাকে, শাশুড়ীকে চোখেও দেখেনি। সাততাড়াতাড়ি দেবনাথের বিয়ে দেওয়ার কারণও সংসারের হাল ধরবার লোক আনা।

দেবনাথ আদিনাথের দ্বিতীয় পক্ষের ছেলে। প্রথম পক্ষের ছুটো মেয়ে, তারা নেহাতই গিন্নীবান্নি হয়ে একজন মরেছে, একজন বিধবা হয়েছে। এ-বাড়িতে তাদের কদাচিৎই দেখতে পাওয়া যায়। থাকেও দূরে।

দ্বিতীয় পক্ষের অর্থাৎ বুড়োবয়সের ছেলে বলে আদিনাথের সঙ্গে দেবনাথের বয়সের তফাৎ এতো বেশী। আর সেই জন্যেই মাধুরীকে প্রায় বিয়ে হয়ে এসে পর্যন্তই অন্ধ শ্বশুরের পরিচর্যা করতে হচ্ছে।

প্রথমে দেখেছিল ছানি পড়া, তারপর পুরো অন্ধ। স্বাস্থ্য এত মজবুত আদিনাথের, কিন্তু চোখে যে কেন এমন ঘুন ধরেছে কে জানে!

সে যাক্, ওই অন্ধ শ্বশুরকে তো মাধুরী 'ঠাকুরসেবা' করে রেখেছে, নিন্দে করবার কোন ছিদ্রই রাখে না। তবু ইদানীং মাধুরী সত্ন এলেই যেন সন্ত্রস্ত হয়। বিরক্তও হয়। আর মুড়ি মজুত থাকলেও টিন পেতে দেয়।

'দরকার নেই, আছে' বললেই তো আবার কাল এসে ধর্ণা দেবে।

চা-জলখাবার ধরে দেবার সঙ্গে সঙ্গে বড়ো জামবাটির একবাটি মুড়ি, চপচপে করে তেল মেখে কাঁচালঙ্কা দিয়ে শ্বশুরের হাতে ধরিয়ে দেয় মাধুরী, আর ভাবে, কী করেই যে পারেন বাবা, আমরা তো পাঁচদিনেও এই মুড়িগুলো খেয়ে উঠতে পারব না।

কিন্তু মাধুরী মেয়ে অতি ভদ্র, অতি সভ্য। তাই মনের কথাকে ঠোঁটের ধারে-কাছেও আসতে দেয় না। বরং বলে, বাবা, আর ছুটি মুড়ি মাখবো নাকি?

মাখবে? আবার মাখবে বলছ? আদিনাথ বলেন, আবার হাঙ্গামা করবে?

হাঙ্গামা আর কি!

বলে মাধুরী দ্বিতীয় প্রস্থ মুড়ি মাখতে যায়।

সুবল উঠলে সেও এ আসরে যোগ দেয়; ভোজন-পর্বে দাদুর সঙ্গী হয়, এবং দাদুকে সাবধান করতে বসে—দাদু, মুড়ি পড়ে যাচ্ছে। দাদু, দেখো দেখো, লঙ্কা। মুড়ির সঙ্গে মুখে পুরে ফেলো না যেন।

তবে বেশীর ভাগ দিনই এ-সময় পড়ে ঘুমোয় সে। আদিনাথ অবশ্য এতে মনঃক্ষুণ্ণ হন, ছেলেটা থাকলে এই খাওয়ার মধ্যে বিশেষ একটি স্বাদ আসে, কিন্তু মাধুরী সাধ্যপক্ষে ছেলেকে ওঠায় না। বরং যাতে ছেলের এই প্রাভাতিক ঘুমটি গভীর হয়, তাই করে। পুবের জানলা বন্ধ করে দেয়, মশারি ভালো করে গুঁজে দেয়।

ছেলে উঠলেই তার পিছনে কাজ আছে, একদিকে বরের ভাত, আর একদিকে শ্বশুরের তোয়াজী চা। এর সঙ্গে আবার ছেলে নিয়ে পড়বার সময় কোথায়? পড়তে তো হবেই। দাদুকে চা খেতে দেখলেই সুবল মুখ না ধুয়েই খেতে বসে যেতে চায়, বকে বকে মুখটা যদি বা ধোয় তো বাসি জামা ছাড়তে রাজী হয় না, বলে দেরি হয়ে যাবে।

তাছাড়া এ সময় অত তরিবৎ করে খেলে ইস্কুলের সময় ভাতটা খাবে কোন্ পেটে?

সুবল না উঠলে আদিনাথ মুড়ির গ্রাস মুখে তোলেন, আর বলেন, শালা নবাবের নাতজামাইয়ের নিদ্রাভঙ্গ হলো না। বড্ডো আয়েসী হয়ে যাচ্ছে বৌমা তোমার ছেলে। এটা ঠিক নয়। সকাল-বেলাটা নষ্ট করলে সারাদিনটাই আধখানা হয়ে যায়। ছেলেকে ভোরবেলা উঠিয়ে দিও—

মাধুরী অম্লান বদনে বলে, কতো ডাকি, উঠতে চায় না।

ওই তো। আয়েসটি বদ্ধমূল হচ্ছে—আদিনাথ অপ্রসন্ন গলায় বলেন, এদের দিয়ে পৃথিবীর কিছু হবে না, কিছু হবে না। কাল থেকে আমিই ডাকব।

মাধুরী মনে মনে বলে, যারা শেষরাত্রে উঠে পড়ে চরে বেড়ায়, তাদের দিয়েই বা পৃথিবীর কী মহৎ কর্ম হচ্ছে?

আর মুখে বলে, বৃথা খাটবেন বাবা, হেরে যাবেন।

তবু ওরই মধ্যে যেদিন নিজেই উঠে আসে সুবল, বলে, মা, আমার ঘর অন্ধকার করে দিয়েছিলে কেন? আমার বুঝি ভয় করে না?

মাধুরী বলে, ওমা শোন কথা, আমি কেন বন্ধ করতে যাব? হাওয়ায় বন্ধ হয়ে গেছে বোধ হয়।

হাওয়ায় ছিটকিনি বন্ধ হয়?

ছেলে প্রবল প্রতিবাদ করে, মাধুরী আবার মিথ্যার জাল বোনে, যায় রে বাবা যায়। তেমন জোরে ঝড়টড় এলে ছিটকিনিও লেগে যায়।

এরপর আর কথা কয়ে সময় নষ্ট করতে চায় না সুবল, বসে পড়ে দাদুর পাশে একটা চৌকি নিয়ে। জোরে হাঁক পাড়ে, মা, আমায় মুড়ি দাও।

মাধুরী এইটি দুচক্ষে দেখতে পারে না, স্কুলের আগে এসব আজেবাজে খাবে কেন? দুটো নাড়ু খাক। দুখানা বিস্কুট খাক, তা নয় বুড়ো ঠাকুর্দাটির মত মুড়ি চাই, বেগুনী চাই। হালুয়াটা দেখতে পারে না, তাই চায় না।

প্রথমটায় বাধা দিতে চেষ্টা করে মাধুরী, বলে এখন আবার মুড়ি ফুড়ি কেন? ভাত খেতে বসে খেতে পারবি না ফেলবি।

সুবল সানাই বাজিয়ে ওঠে, না, আমি মুড়ি খাব, বেগুনী খাব।

সঙ্গে সঙ্গে আদিনাথ বলে ওঠেন, চাইছে বৌমা দাও না চারটি। মুড়িতেও পুষ্টি আছে, ভাত দুটি কম খায় ক্ষতি নেই।

মাধুরী বেজার মুখে একবাটি মুড়ি ঢেলে এনে ছেলের সামনে ধরে দেয়, সঙ্গে সঙ্গে সুবল চেঁচিয়ে ওঠে, তেল কই?

ছোট ছেলের তেল-ফেল মেখে খেতে নেই, বলি না? মাধুরী ধমক দিয়ে ওঠে, সব কিছু বুড়ো কর্তার মতো।

আদিনাথ পুত্রবধূকে সমর্থন করার ধার দিয়েও না গিয়ে, হা হা করে হেসে বলেন, এই এক বুড়ো কর্তার সঙ্গে মিশেই এত অধঃপাত তোমার ছেলের বৌমা। ছাড়বে না, দাও একটু।

মাধুরীকে বাধ্য হয়েই দিতে হয় তেল-নুন। রেগে রেগে বলে, কাঁচা লঙ্কা চাই না? কাঁচা লঙ্কা?

ও বাবা—বলে সুবল দাতুর কাছ ঘেঁষে জমিয়ে বসে, লঙ্কা খেলে তোমার ঠোঁট জ্বালা করে না দাতু?

মাধুরী ঘরের মধ্যে গিয়ে বিড়বিড় করে বলে, হচ্ছেন, ঠিক দাতুটির মতন হচ্ছেন, তার মানে ছেলের বৌয়ের হাড়মাস পুড়িয়ে খাবেন।

অথচ আপাতদৃষ্টিতে আদিনাথ ছেলের বৌয়ের সঙ্গে কোন তুর্ব্যবহারই করেন না। কথা যা বলেন হেসেখুশে ভালভাবেই।

পাড়ার আরোপাঁচটা বুড়োর মতো খিটখিটে নয়, বদমেজাজী নয়, ভেতর-গোঁজা নয়। পাশের বাড়ির রত্নারও শাশুড়ী নেই। বেচারীর শ্বশুরকে নিয়ে কী যে জ্বালা!

রত্না বলে, মুখ ফুটে কিছুটি বলবেন না ভাই, অথচ সব তাতেই অসন্তোষ। মন বুঝে বুঝে করতে হবে। আর প্রাণপাত করে যা কিছু ধরে দেব তার ব্যাখানা করতে বসবেন। কিছুই নাকি আমার শাশুড়ীর মতো হয় না, আচ্ছা ভাই, যাকে আমি চক্ষেও দেখলাম না তার মতো হবো কী করে···তোর শ্বশুর চেয়েচিন্তে ডাকহাঁক করে খান বাবা, বেঁচে গেছিস তুই।

মাধুরীর সব কথা মনে মনে।

মনের মুখোমুখিই বিড়বিড় করে সে, বেঁচেই গেছি বটে! এদিকে নাভিশ্বাস উঠছে। একটা মানুষে চারটে মানুষের খাওয়া খেলে এই বাজারে যে কী অবস্থা হয়, তা সে যে করে সেই বোঝে।···আবার আমার ছেলেটাকে সুদ্ধু চাষাড়ে করে তুলছেন।

তা মাধুরীর কথাগুলো মিথ্যা নয়, মাধুরী আর মাধুরীর বর তুজনে মিলে যা খায়, আদিনাথ একাই তার ডবল খান। মুড়ি-পর্বের পরই নাতির হাত ধরে খানিকটা ঘুরতে বেরোন আদিনাথ, এবং বেরোবার আগে ছেলেকে তাড়া লাগিয়ে যান, সাড়ে আটটার ট্রেন ধরতে হবে। সাতটা অবধি শুয়ে আছিস? ওতে কি আর শরীর থাকে?

সকালে একটু কিছু খাওয়া দরকার। ঘুম থেকে উঠেই চান করতে যাবে তুমি। আর এসে চা-টা পেটে ঢেলেই ভাত খেতে বসবে। স্বাস্থ্যর দফা একেবারে গয়া করছ।

বলে-টলে বেরিয়ে যান।

ফেরেন একেবারে ঘড়ির কাঁটা বুঝে। যাতে ছেলের সঙ্গে দেখা হয়।

কিন্তু দেখাটা কি হয় আদিনাথের? বরং বলা ঠিক, কথা হয়। অবশ্য কথা মানে উপদেশ।

ওই যে মিনিট-চল্লিশ বেড়িয়ে আসেন, ওইটুকুই আমার মাথা ঠাণ্ডা—মাধুরী স্বামীর সামনে ভাত বেড়ে ধরে দিয়ে বলে, এটুকু ছুটি না পেলে আর তোমাকে টাইমমতো ভাত দিতে হত না।

কিন্তু আজকাল আর বলে না।

আজকাল যেন ওই টাইম সম্পর্কে কেয়ারই নেই মাধুরীর। অবিশ্যি ভাতটা ঠিকই ধরে দেয় আটটার সময়, কিন্তু তাতে যেন আগ্রহ নেই। খেটে খেটে মানুষটা কি নীরস হয়ে গেল? তাই যন্ত্রের মতো কাজ করে যায়! হৃদয়ের উত্তাপ খুঁজে পাওয়া যায় না!

কিন্তু আদিনাথ উত্তাপে ভরপুর। বেড়িয়ে এসেই দরাজ গলায় বলবেন, দেবু খেতে বসেছিস নাকি?

দেবু তখন হয়তো বসেছে, নয়তো চুল আঁচড়াচ্ছে। বলে, এই যে বসলাম।

আদিনাথ আন্দাজমতো ছেলের সামনে গিয়ে বসেন, বলেন, কি কি রাঁধলে বৌমা?

বৌমা যা উত্তর দেয়, বলা বহুল্য তাতে মন ওঠে না আদিনাথের। তিনি ক্ষুণ্ণ গলায় বলেন, মাছ হল না? বাঙালীর হল মাছে ভাতে শরীর—

দেবনাথ অন্তরালবর্তিনীর ক্ষুব্ধ মূর্তি কল্পনা করে তাড়াতাড়ি বলে, ওঠে, এসময় ওসব মাছফাছ খেতে পারা যায় না বাবা, কাঁটা লেগে যেতে পারে—আমিই বারণ করে দিয়েছি, ওবেলা ধীরেসুস্থে খাব।

তবে একটু দুধভাত খা। আদিনাথ ডাক দেন, বৌমা, দেবুকে একটু দুধ দাও দিকি।

আদিনাথ যে চোখে একেবারেই দেখতে পান না সেটা একপক্ষে, মানে এদের পক্ষে, সুবিধে। বাবার চোখের সামনেই চোখ টেপা চলে।

অতএব দুধভাত না খেয়েই বাবাকে সন্তুষ্ট করা যায়।

আদিনাথ বলেন, দিলে ?

দেবনাথ তাড়াতাড়ি বলে, হুঁ।

কিন্তু যতক্ষণ দেবনাথ থাকে আদিনাথ তার সঙ্গ ছাড়েন না। টিকটিক করতে থাকেন, ছাতা নিয়েছিস ? মণিব্যাগ ভুলিসনি তো ? বৌমা, টিফিন দিয়েছো ?

একটা ইন্দ্রিয় অকেজো হয়ে যাওয়ায় আর একটা ডবল খাটছে। অর্থাৎ ডবল খাটাচ্ছেন আদিনাথ তাকে। কথার আদান-প্রদানেই দেখার অনুভূতিটুকু আদায় করে নিতে চান তিনি।

যাত্রাকালে মাধুরী যে বরের একটু কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াবে, হাতে পানটা দিয়ে একটু হাসবে, সে মুড থাকে না। হতে পারেন মানুষটা দৃষ্টিশক্তিহীন, তবু একটা বিরাট উপস্থিতি তো ? সমীহ বোধটা যাবে কোথায় ? চোখ টিপে দুধ দিতে বারণ করা যায়, কিন্তু পরস্পরে চোখে চোখ রেখে হাসা যায় না।

রত্না বলে, তুই তো বাবা দিব্যি মজায় আছিস, বুড়ো ভদ্দরলোক চোখে দেখতে-টেখতে পান না। নিজের ইচ্ছেমতো সব কিছু করতে পারিস। আমার যে সর্বদা সব কিছুতে চোখ দেওয়ার জ্বালায় জীবন মহানিশা ! মেয়েমানুষের অধিক ! কী চোখ ! উঃ। সেই যে বলে না শ্যেন দৃষ্টি—তাই। কিসে একটু খরচ বেশী করে ফেললাম, কখন কাজ ফেলে একখানা গল্পর বই নিয়ে বসলাম, কখন অসাবধানে বিষ্টি এসে ছাতের শুকনো কাপড় ভিজে গেল, কখন রোদ বয়ে যাচ্ছে, অথচ বড়ি আচার বিছানা কাঁথা শুকোতে দিচ্ছি না, এই নিয়ে অষ্টপ্রহর টিকটিক।

মাধুরী এত কথা বলে না, শুধু একটু হেসে বলে, টিকটিক করতে ইনিও কম যান না।

আহা, সে তো না দেখে। তুই বেমালুম গেপে ফেলতে পারিস। বলতে পারিস—হ্যাঁ বাবা, রোদে দিয়েছি তো···না বাবা, ভেজেনি তো···বই তো পড়ছি না বাবা, জামায় বোতাম বসাচ্ছি—

রত্নার বলার ধরনে হেসে ওঠে মাধুরী, বলে, যাঃ ওইরকম জলজ্যান্ত মিছে কথা বলা যায়?

যাবে না কেন? রত্না অনায়াসে বলে, আমি হলে ঠিক তাই করতাম। কথাতেই আছে আত্মরক্ষাই মূল ধর্ম। গিন্নী-মরা-শ্বশুরের মতো অশান্তি আর কিছুতে নেই বাবা।···ওঁর যেন সর্বদাই মনে হচ্ছে ওঁর গিন্নীর হাতের পাতানো সোনার সংসারখানি এক আনাড়ির হাতে পড়ে তছনছ হয়ে গেল। এক এক সময় রান্নাঘরে ভাঁড়ার ঘরে, খাবার ঘরে, সকল জিনিসের দিকে এমন নিরীক্ষণ করে তাকিয়ে থাকেন, দেখে যেন গা সিরসির করে। মনে হয় যেন ভেতর পর্যন্ত দেখছেন। আর 'তাঁকে'ও দেখছেন।

মাধুরী চুপ করেই শোনে, কারণ মাধুরীর কাছে তো এর সমর্থন নেই। মাধুরীর শ্বশুরের দৃষ্টিই নেই। অতএব বলতে পারে না, ওরে জানিস না, এ-বাড়ির কর্তা সর্বদা ওই দৃষ্টিহীন দৃষ্টি দিয়েই সব কিছু লেহন করেন, দেখে আমারও গা সিরসির করে।

করে, সত্যিই করে!

আদিনাথ যখন বাজার থেকে আনা কাঁচা তরকারি আনাজগুলো হাত বুলিয়ে বুলিয়ে অনুভব করেন, যখন সুবলের গালে মুখে বুকে পিঠে হাত বুলিয়ে দেখেন সে রোগা হয়ে যাচ্ছে না বাড়ছে-টাড়ছে—মাধুরীর গা সিরসির করে। যেন উনি ওঁর হারানো ইন্দ্রিয়টার বদলে আর কোন একটা ইন্দ্রিয়কে জন্ম দিচ্ছেন আপ্রাণ কোন চেষ্টায়।

দেবনাথ বেরিয়ে গেলে আদিনাথ দ্বিতীয় প্রস্থ বেরোন পাড়া বেড়াতে। সুবল হাত ধরে ধরে নিয়ে যায়, রাস্তায় প্রতি পদক্ষেপে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

সামনে কেউ আসছে বুঝলেই বলে ওঠেন, কেরা্যা সুবল ?

সুবল বলে, অমিয় জ্যাঠা···বলে, কুটুর দাদু···বলে, বলুদার পিসি।

অতএব দাঁড়িয়ে পড়তেই হয় আদিনাথকে। এমন সব দরকারী লোকগুলো নাকের সামনে দিয়ে চলে যাবে ? আদিনাথ তাদের ডেকে কুশল প্রশ্ন করবেন না ? আদিনাথ যে সকলেরই বাপ-জ্যাঠার বয়সী। আদিনাথ তাই লোকটা কাছাকাছি হবার আগেই গলা তুলে সম্ভাষণ করেন, কে, অমিয় নাকি ? তোমার আজ অফিস নেই ? আছে ? সাড়ে নটার ট্রেন ধরবে ? তা তোমার তো হাওড়াতেই অফিস—অসুবিধে নেই, দশটার মধ্যেই পৌঁছে যাবে। দেবুটারই মুশকিল, হাওড়া থেকে আবার ড্যালহাউসী আসা।

বলেন, কে, সরল আসছ নাকি ? অনেকদিন পরে রাস্তায় বেরিয়েছ মনে হচ্ছে ? কুটু বলেছিল দাদুর অসুখ করেছে, হয়েছিল কি ? জ্বর ? কেন ? ঠাণ্ডা লাগিয়েছিলে বুঝি ? আমার তুমি হাঁটুর বয়সী হলেও আস্তে আস্তে তো বয়েস হচ্ছে ভায়া, একটু সাবধানে থাকা ভাল।

বলেন, কে আসছে ? নন্দরাণী ? কেমন আছিস মা ? অনেকদিন তো আর যাস-টাস না মা ! একটা কানা অন্ধ কাকা পড়ে আছে একটু দেখতে-টেখতে যাস। একা একা প্রাণ হাঁপায়।

নন্দরাণী লজ্জিত গলায় বলে, যাব বামুন কাকা, যাব-যাব তো ভাবি, সংসারের কাজ সারতে সারতেই উদয়-অস্ত। বলুর মা, মানে আমার ভাজের কথা বলছি কাকা, কুটোখানি ভেঙে দুটোখানি করে না ! রাতদিন সেলাই বোনা, গালগল্প। এখন আবার 'বিহঙ্গবালা ইস্কুলে' এক চাকরি নিয়েছে—

চাকরি ? কিসের চাকরি ?

আদিনাথ উত্তেজিত হন, গেরস্ত ঘরের বৌ, আবার চাকরি-ফাকরি কিসের ?

ওই তো কে বলে ! নন্দরাণী—মহোৎসাহে বলে. ঢের নিষেধ

করেছি, শুনলে তো ? বলে কিনা তুমি তো সবই করছ ঠাকুরঝি. আমি কেন শুধু হাত-পা কোলে করে বসে থাকি ? তাই ওখানের সেলাই দিদিমণির চাকরিটা নিয়ে নিলাম। তার ওপর আর কথা কি ? করছেন চাকরি ? বাঁদী আছে, সংসার করছে। তা যাব বামুন কাকা, ঠিক যাব।

কথাটা হয়তো রাখে, হয়ত রাখে না। অথবা এত দেরিতে রাখে যে, আদিনাথের মনে থাকে না নন্দরাণীকে তিনি কোনদিন আসতে বলেছিলেন। এইভাবেই পরিক্রমা চলে আদিনাথ নামের মজবুত শরীর অসহায় মানুষটার। অনেক সময় আবার পথে দেখা লোকটা চোখ-মুখের ইশারায় সুবলকে বলে, বলিসনি, নাম করিসনি। কাজ আছে, পালাই।

সরে পড়ে। কারণ আদিনাথ একবার ধরলে তো সহজে ছাড়েন না।

সুবল অতএব নিতান্ত সরল গলায় বলে, কেউ আসছে না তো দাদু! ওঃ, ও একটা এমনি লোক। চিনি না।

সুবল এই ব্যাপারটার মিথ্যা ভাষণের দিকটা দেখে না, কৌতুকের দিকটা দেখে। তাই মুখে হাতচাপা দিয়ে হাসি চেপে বলে, ও একটা কালোমতন বিচ্ছিরী লোক গেল।

আদিনাথ কেমন আন্‌মনা হয়ে যান, যেন ভাবতে চেষ্টা করেন, এ পাড়ায় আবার হঠাৎ বাজে লোক এল কোথা থেকে!

সুবল এক-একসময় বলে, আচ্ছা দাদু, তুমি তো দেখতেই পাও না, তবে কি করে বুঝতে পার কেউ আসছে ?

কানাকে কানা ও খোঁড়াকে খোঁড়া বলিতে নাই—পাঠ্যপুস্তকের ও উপদেশ মানে না সুবল, অনায়াসেই ঠাকুর্দাকে বলে তুমি তো দেখতেই পাও না—।

এ প্রশ্নে আদিনাথ হঠাৎ কেঁপে ওঠেন। সারা শরীরের মধ্যে যেন একটা প্রবল জলোচ্ছ্বাস ওঠে তাঁর, তবু কষ্টে হেসে বলেন, ভগবান এখনো ওই শক্তিটুকু রেখেছেন দাদু।

সুবলও কম কথাতে নয়, সুবল বলতে বলতে চলে, জান দাদু, আমাদের ইস্কুলে একজন নতুন দিদিমণি এসেছেন, কাল থেকে পড়াবেন। আচ্ছা দাদু মেয়েদের ইস্কুলে দিদিমণি পড়াবেন, ছেলেদের ইস্কুলে মাস্টারমশাই, এই তো নিয়ম? তা নয়, আমাদের পড়াবার জন্যে এক দিদিমণি! জানি না কপালে কী আছে!

সুবলের এই কপালের চিন্তায় হেসে ওঠেন আদিনাথ, বলেন, কপালে প্রহার আছে আর কি, মেয়েমানুষের প্রাণে মায়া-দয়াটা তো কম।

কেন যে এহেন ধারণা আদিনাথের সে কথা নিয়ে মাথা ঘামায় না সুবল, ততক্ষণে অন্য প্রসঙ্গে চলে যায়।

তারপর বিহারী ডাক্তারের বাড়িতে এলে, বসিয়ে দিয়ে চলে যায় সুবল স্কুলের বেলা হয়ে যাচ্ছে বলে। সুবলকে আর সম্যক আপ্যায়িত করা হয় না বিহারী ডাক্তারের। না হলে পাড়ার সকলেই তো এই ছেলেটাকে ভালবাসে। বলে, কী গুণের ছেলে দেখ! এ যুগে এমন ধীর স্থির ছেলে দেখাই যায় না। কোন্ ছোট্ট বেলা থেকে ওই অন্ধ দাদুর সঙ্গী হয়ে হাত ধরে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

সত্যিই ওই বয়সের ছেলেদের পক্ষে সুবল খুবই ধীর স্থির বিচক্ষণ। বোধ করি ছোট্ট থেকে একটা মস্ত মানুষের দায়িত্ব ঘাড়ে পড়ে যাওয়ায় সুবল এমন বিচক্ষণ বিজ্ঞ।

যদিও ওর মা ছেলের ধরন-ধারণ আদৌ পছন্দ করে না, রাগ হলেই দাঁতে দাঁত পিষে বলে, পাকা বুড়ো জন্মেছে একটা, পাকা বুড়ো! সাত বছর তো নয়, সত্তর বছর বয়েস ওর।

হয়তো মায়ের পক্ষে এ রাগটা স্বাভাবিক, মা তো তার শিশুসন্তানকে শিশুর মতোই দেখতে চায়। কিন্তু ছেলেটা অন্য পাঁচটা শিশুর মতো উদোমাদা দুরন্ত আবদেরে হলে ওই চোখ-যাওয়া শ্বশুরকে নিয়ে কী দুর্গতি হত মাধুরীর, তা ভাবে না মাধুরী। বলতে গেলে আদিনাথের বারো আনা ভারই তো সুবলের ওপর। বিশেষ করে রাস্তায় নিয়ে যাওয়ার। ওই মানুষ যদি সারাদিন বাড়ি বসে থাকতেন, মাধুরীর তো

কাজকর্ম মাথায় উঠে যেত। আবার জেদ করে যদি একাই বেরোতেন, কী বিপদটাই হত।

এখানের রাস্তায় বাস ট্রাম গাড়িফাড়ির ভিড় ততটা না হলেও, সাইকেল আরোহী আছে, সাইকেল-রিকশা আছে, তার সঙ্গে আছে দু'পাশে ঝোপঝাড় গজানো সরু রাস্তা, কাজেই আন্দাজে বুঝে পাশ কাটাতে গেলে যে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যেতে না পারেন তাও তো নয়।

তাছাড়া—পথে ছাড়া গরুরা যথেচ্ছ বিচরণ করে না? তাদের সামনে পড়লে? শুধুই যে চোখে দেখতে পান না তাও তো নয়। আশী বছরের অধিক বয়েসটাও তো হয়েছে!

একটা কিছু বিপদ হলে লোকে কাকে দুষবে? মাধুরী ছাড়া? আদিনাথের ছেলে তো সারাদিনই বাইরে।

সুবলই মাকে প্রাণে-মানে রক্ষা করছে। কিন্তু দুনিয়ার ধর্মই তো উপকারীর সমালোচনা করা। তাই ছেলের সমালোচনা করে মাধুরী।

বাড়ি ফিরে সুবল চান করে খেতে বসে, এবং মাকে সাবধান করে যায়—দাদুকে ঠিক সময় এনো।

এই আনাটা মাধুরীর দায়িত্ব। অবশ্য নিজে সে আনতে যায় না বিহারী ডাক্তারের বাড়ি। বাসনমাজা ঝি সুশীলের মার সুশীলকে পাঠিয়ে দেয়।

আদিনাথ এক পায়ে খাড়াই থাকেন। কারণ তখন তাঁর তেল মাখার সময় হয়ে আসে। চামড়া জ্বালা করতে থাকে।

বিহারী ডাক্তার পুরো ডাক্তার নয়, হোমিওপ্যাথ ডাক্তার, কিন্তু তার পসার কম নয়। কারণ তিনটি।

প্রথম কারণ গ্রামের মধ্যে কাছাকাছি কোন অ্যালোপ্যাথ নেই, দ্বিতীয় বিহারী ডাক্তারের ওষুধ নাকি ডেকে কথা কয়। আর তিন নম্বর কারণ হচ্ছে বিহারী ওষুধের দাম ছাড়া ভিজিট-ফিজিট কিছু নেয় না। লোকে অবশ্য বলে, ওই ওষুধেই সেরে দিয়েছে। আট আনা বারো আনা করে একটা ডোজ। সোজা লাভ!

আদিনাথ অবশ্য ওই আট আনা বারো আনা দেন না, আদিনাথের

বাঁধা রেট চার আনা। রোজ ওই চার আনাটি খরচ করেন আদিনাথ। করেন, কিন্তু নিঃশব্দে করেন, কাকে-পক্ষীতে টের পায় না। বিহারীও নিমকহারামা করে না, কাউকে বলে বেড়ায় না।

বলে বেড়ালে তারও হয়তো কিঞ্চিৎ লজ্জার কারণ ঘটত। কারণ তাহলেই তো ধরা পড়ত বিহারী ডাক্তার আদিনাথ চাটুয্যেকে পর্দা পড়ে যাওয়া চোখকে সারিয়ে দেবার প্রলোভন দেখিয়ে টাঙিয়ে রেখেছে।

রেখেছে সত্যি টাঙিয়ে।

কিন্তু কেন রেখেছে সেটা তো আর কেউ ভেবে দেখবে না, ভাববে পয়সার লোভে। অথচ পয়সার লোভে আদৌ না। নিতান্তই মমতার বশে এই কাণ্ডটি করে বসে আছে বিহারী।

অনেকদিন থেকেই চলছে এই চিকিৎসার পালা। কিন্তু বিহারী কি জানত বুড়ো এই মনমরা মন নিয়ে আশী বছরও পার করে ফেলবে? কতোদিন আগে একদিন বলেছিল, আছে ওষুধ। হোমিওপ্যাথিতে মরা মানুষ বাঁচাবার ওষুধও আছে, কিন্তু ধৈর্য ধরতে হবে, সময় নেবে।

আর মনে মনেভেবেছিল, ততদিনে তোমার সময়টিফুরোবে বুড়ো। তবে—তবু তো তুমি একটা আশা নিয়ে বেঁচে থাকবে।

আবার আমি আমার চোখ ফিরে পাব? এই প্রশ্নটা কি গভীর আকুলতা আর প্রবল উত্তেজনা নিয়েই না বলেছিল বুড়ো।

গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল বিহারী ডাক্তারের। আর তখনই ভেবেছিল—এই আশাটিই তোমার জীবনতরুতে জলসিঞ্চন হবে হে আদিনাথ চাটুয্যে!

তা হচ্ছেও।

আদিনাথ তাই বিহারীর চেম্বারের নিত্য খদ্দের। আদিনাথ একটা কোণের দিকে একটা হাতলভাঙা চেয়ারে বসে থাকেন, বিহারীর যত খদ্দের আসে তাদের কথা এবং বিহারীর কথা মন দিয়ে শোনেন, আর ওরা চলে গেলে সেই কথার মূল সূত্র টেনে বার করবার জন্যে প্রায় জেরাই করতে বসেন বিহারীকে।

আচ্ছা বিহারী, ওই যে লোকটা বলল, তার পেটব্যথা সারছে না, ওকে তুমি রেগে রেগে কি বললে ?

বিহারী বলে, কি আর বলব—চাটুয্যে মশাই, বেটা একদিকে ওষুধ খাবে, অন্যদিকে কুপথ্যি করবে। সারবে কিসে ? তাই ধমকে দিলাম। কাঁকড়া চিংড়ি মাছ হাঁসের ডিম এসব খাওয়া চলবে না। তাই হতভাগা বোকার মতো জিজ্ঞেসা করল কিনা তাহলে কি খেয়ে থাকব ? যেন জগতে ওই তিনটি জিনিস ছাড়া আর জিনিস নেই। অবিশ্যি শাক, অম্বল চচ্চড়ি-ফচ্চড়ি, এগুলোও খেতে বারণ করেছিলাম। তা যেমন রোগ তার তেমনি চিকিৎসা হবে তো ? ওষুধ খাচ্ছিস বলে অত্যেচার চালিয়ে যাবি ? এই যে আপনাকে বলে দিয়েছি, রোজ ভোরবেলা দশ মিনিট সময় সূর্যের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে থাকবেন, থাকছেন না ?

তা তো থাকছি ডাক্তার, আদিনাথ অন্যমনা ভাবে বলেন, কিন্তু হচ্ছে না তো কিছু !

কোন ইমপ্রুভমেণ্ট বুঝতে পারছেন না ? জোর দিয়ে বলে বিহারী ডাক্তার, একেবারে কিচ্ছু না ?

যেন হচ্ছে ঠিকই, তবে সেই হওয়াটা আদিনাথ জানতে পারছেন না।

আদিনাথ তেমনি অন্যমনা ভাবেই বলেন, মানে কি জান ? মাঝে মাঝে যেন মনে হয় আবছা যে বেগুনী মতো একটা আলো চোখের সামনে থাকে, সেটা বুঝি একটু উজ্জল হল, বুঝি আগুনের ফিনকির মতো কী দু-একটা ছিটকে গেল—

ব্যস্, ব্যস্ ! বিহারী ডাক্তার প্রায় উথলে ওঠে, আপনি ধৈর্য ধরে লেগে থাকুন দাদা। হয়ে যাবে। মহামতি হানিম্যানকে স্মরণ করে খেয়ে যান।

বলেই নিজেই বিহারী সেই মহামতির উদ্দেশ্যে হাত জোড় করে।

সুশীল তাড়া লাগাচ্ছে, আদিনাথ উঠে পড়েন। বলেন, আচ্ছা ভায়া চলি। আবার কাল দেখা হবে।

বলেই হঠাৎ কেমন একটু হেসে উঠে বললেন, দেখেছ অভ্যাসের দোষ? রোজ এই ভুলটি করবো। দেখা হবে নয়, কাল আবার বুড়োকে দেখতে পাবে।

সুশীলকে কিছুতেই হাত ধরতে দেন না আদিনাথ। বলেন, তুই চল তো সঙ্গে সঙ্গে, তাহলেই হবে।

মাসীমা বলে দেছে হাত ধরে নে যেতে—

বলুক। তুই দেখে দেখে বল পায়ের কাছে ইট-পাটকেল আছে কিনা। গরু-ছাগল আসছে কিনা।

নাতির হাত ধরে বেড়ান, তার মধ্যে একটা গৌরব আছে। কিন্তু ঝিয়ের ওই ময়লা নোংরা ছেলেটার হাত ধরে! ছিঃ! অন্ধ নাচারের প্রতিমূর্তি।

হাত দুটো সামনের দিকে বাড়িয়ে কিছু যেন একটা ধরবার ভঙ্গীতে এগিয়ে এগিয়ে চলেন আদিনাথ, এখন আর পথে কারুর সঙ্গে কথা হয় না। এ সময় লোকও কম। সকালের কর্মব্যস্ততার কালে জীবনের কিছু সাড়া পাওয়া যায়, তার পরেই তো সব ঝিম মেরে যায়।

বাড়িতে ঢুকে দালানে পাতা আদিঅন্তকালের তেলচিটে পড়া বড় চৌকিটার ওপর বসে পড়েন। তখন আদিনাথ যেন পায়ের তলায় মাটি পান। ধাতস্থ হয়ে গায়ের ফতুয়াটি খুলে অভ্যস্ত হাতে জানলার কোণে ঝুলিয়ে দিয়ে ডাক পাড়েন, বৌমা, তেলটা দেবে নাকি?

প্রশ্নটা বাহুল্য। তেলটা দাও বলাই ঠিক, কিন্তু সৌজন্যের ওই ভঙ্গীটুকু আছে আদিনাথের প্রকৃতিতে।

মাধুরীর এখন রান্নাবান্না হয়ে গেছে। স্নানটানও সারা হয়ে গেছে। দ্বিতীয় প্রস্থ চা-টাও পেটে পড়েছে। স্বামী-পুত্র অফিস ইস্কুল চলে গেছে, তাই মাধুরীর মুখ-চোখে এখন একটু স্নিগ্ধ ধরনের সহিষ্ণুতা।

মাধুরী একটা কাঁচের বাটিতে তেল এনে নামিয়ে দিয়ে বলে, সুশীল তেলটা মাখিয়ে দিক না বাবা।

আদিনাথ বলেন, না না, কোন দরকার নেই। নিজে হাতে না ডললে আরাম আসে না।

তা নিজে হাতে ডলে ডলে আরাম করে তেল মেখে স্নান করে আসতে ঘণ্টাখানেক লাগে, এই সময়টা মাধুরী ঘর-টর গোছায়। সেলাই-টেলাই করে।

স্নানের জন্যেও সাহায্য লাগে না আদিনাথের। শুধু বলে দিতে হয়, দরজা থেকে ডানদিকে বালতিটা আছে বাবা।

উঠোনের মাঝখানে কুয়োতলার পাশে একটু যে ঘেরা জায়গা, সেটাই আদিনাথের স্নানের জায়গা। দেবনাথ বাবার সুবিধের জন্যে ওটি তৈরি করিয়ে দিয়েছে।

স্নান সেরে এসে দিনের মধ্যেকার সর্বাপেক্ষা আনন্দজনক কাজটির সামনে (অন্ততঃ মাধুরী তাই ভাবে) এসে বসেন আদিনাথ।

মাধুরী বুঝিয়ে বুঝিয়ে দেয়, সামনের দিকে পলতার বড়া বাবা, তারপর থোড়-ছেঁচকি···হ্যাঁ, ওইখানে পোস্ত চচ্চড়ি, মাথায় চাটনির বাটি, আমড়ার চাটনি, আর এই যে এখানে মাছের ঝোল। কাঁটাটা কি বেছে দেব বাবা?

মাধুরীও সৌজন্যে কম যায় না। এই বাহুল্য সৌজন্য প্রশ্নটুকু রোজই করে।

আদিনাথ বলেন, না না। চোখই গেছে। আঙুলগুলো আছে। ওরা ঠিক কাজ উদ্ধার করে দেবে।

অনেকক্ষণ ধরে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে পরিপাটি করে খাওয়াটি সারেন আদিনাথ। মাধুরী পাখা নেড়ে নেড়ে মাছি তাড়ায়। আর হাই তোলে। আর মাঝে মাঝে দেওয়ালে টাঙানো দৈনিক পাঁচ-সাত মিনিট করে স্লো হয়ে যাওয়া বহুকালের পুরনো দেয়াল-ঘড়ির দিকে তাকায়।

আদিনাথ অবশ্য মাঝে মাঝে বলেন, পাখাটা আমায় দিয়ে তুমি যাও বৌমা, খেয়ে নাও গে। বাঁ হাতে বেশ পাখা নাড়াবো। কিন্তু মাধুরী সেদিকে নেই। দু-একদিন এই প্ররোচনায় ভুলে সে খুব ঠকেছে।

তা লজ্জা পাওয়াই ঠকা।

যেই ভাতটি খাওয়া শুরু করেছে, আদিনাথ ডাক দিয়ে বসেছেন, বৌমা বসে পড়েছ নাকি ? বসে থাক তো থাক্ থাক্—

মাধুরী চট করে উঠে পড়ে হাত ধুয়ে বলে, না না, এখনো বসিনি বাবা। কি দেব ?

আদিনাথ অপ্রতিভের গলায় বলেন। দ্যাখ তোমায় জ্বালাতন করলাম, আর গোটা দুচ্চার ভাত লাগত।

প্রমাদ গণবারই কথা। কারণ আদিনাথকে বারবার জিজ্ঞেস করবার পর তবে হাঁড়ি চেছেমুছে ভাতটা বেড়ে নিয়ে বসেছিল বেচারী। তবে ভগবান মুখ রক্ষে করেন, সুবলের জন্যে ভাত বাড়া থাকে, ইস্কুল থেকে ফিরে ভাত না দেখলে চটে যায় সুবল। মুড়ি নাড়ু আম কলা কিছুই পছন্দ হয় না তার। সেই ভাত থেকেই দিতে হয় আদিনাথকে। মানে প্রায় সবটুকুই দিতে হয়। সুবলের আর কতটুকু থাকে। আদিনাথের কাছে সেই সবটাই গোটা দুচ্চার।

কিন্তু শুধুই তো ভাত দিলে চলে না। মাছ তরকারি ঝোল সবই তো ফিনিস করে বসে আছেন আদিনাথ।

আদিনাথ বলেন, আছে নাকি আর ?

বাঃ, থাকবে না কেন ? ঢোক গিলে আর প্রায় চোখের জল চেপে মাধুরী ছেলের জন্যে তুলে রাখা তরকারি মাছ ভাজাভুজি সব ঢেলে দেয় শ্বশুরের পাতে।

আদিনাথ বলেন, আর একখানা লেবু যদি দিতে বৌমা ! বলেন, অমনি একটু নুনও এনো বৌমা।

এরপর আঁচাবার জন্যে হাতে জল ঢেলে দিতে হয়। খড়কে এগিয়ে দিতে হয়। গামছা এনে হাতে ধরিয়ে দিতে হয়। তবে ছুটি।

আদিনাথ দক্ষিণের জানলাটি খুলে দিয়ে তাকিয়াটি নিয়ে শুয়ে পড়েন।

মাধুরী বিড়বিড় করে বলে, আমাকে খেয়ে তবে যাবেন।

তারপর নিজের থালায় বাড়া অন্নব্যঞ্জন ছেলের জন্যে ঢেকে রেখে দুটো নাড়ু মুখে দিয়ে জল খেয়ে শুয়ে পড়ে।

দু'একদিন আবার তাও হয়ে ওঠেনি। মাধুরীর প্রায় সব খাওয়া হয়ে যাবার পর আদিনাথ বলেছেন, বৌমা, বসে পড়েছ নাকি?

মাধুরী ভেবে পায় না আশী বছর বয়সে এত ক্ষিদে আসে কোথা থেকে! মাধুরী যে এই এতখানি বেলা অবধি খাটাখাটুনি করল, কই ওঁর সিকির সিকিও তো খেতে পারে না! অথচ সকালে তো সেই চায়ের ওপর—

দেবনাথেরও তো একই অবস্থা।

সকালে তো দেবনাথ সুবলের থেকেও কম ভাত খেয়ে চলে যায়, রাত্রে গুনে চারখানা রুটি, তাও আলাদা পাতলা পাতলা, আর আদিনাথ?

খান দশ-বারো তো খাবেনই, তাছাড়া মোটা মোটা। পাতলা রুটিতে উনি নাকি সোয়াদ পান না! এবং সকালে মনে হয় রাতে উপোস করে শুয়ে ছিলেন!

মাধুরী ধরে নিয়েছে ওঁর পেটে ভস্মকীট আছে।

নির্ঘাতই আছে।

নচেৎ এই বেলা একটার সময় ওইরকম রামরাজত্ব করে খেয়ে, আবার বিকেলে চায়ের সঙ্গে কিছু না কিছু চাই!

কোনদিন চিঁড়ে ভেজে দিতে হয়, কোনদিন ছোলা-মটরের ঘুগনি করে রাখে, কোনদিন বা খানকতক আলু-মরিচ।

পরিতৃপ্তি করে খেয়ে আদিনাথ শুধোন, দেবুর জন্যে রেখেছ তো বৌমা? এসে চায়ের সঙ্গে খাবে।

মাধুরী বেজার গলার রুক্ষতাটুকু কষ্টে সামলে বলে, চা খাবার আর সময় কোথায় থাকে বাবা? সেই তো রাত্রি আটটা বাজিয়ে আসা!

বাস্তবিকই তাই।

অফিসের ছুটি সাড়ে চারটের সময় হলে কি হবে, ড্যালহাউসী থেকে হাওড়া স্টেশন, হাওড়া স্টেশন থেকে বাবুগ্রাম স্টেশন। সেখান থেকে বাড়ি। এই পথটি আসতে সাড়ে তিন ঘণ্টা লেগে যায় দেবনাথের।

আদিনাথ জানেন, তবু বলেন, তা চা তো খায় এসে!

ওই চা-ই। তাছাড়া আর কিছু দিলে খেতে চান না। আর ঘি তেলের জিনিস তো ছুঁতেই চান না, জানেন।

জানেন আদিনাথ, তবু মন থেকে মানতে পারেন না। অসন্তুষ্ট গলায় বলেন, এই বয়সেই এত খুঁতখুঁত! বয়েস হলে যে কী করবে এরা! অ্যাঁ!

কি করবে তা মাধুরীও জানে না, তবে বাপের ধারায় যে যাবে না এটা ঠিক।

আদিনাথ যদি বেশ মোটাসোটা একটি পেন্সন না পেতেন, তাহলে মাধুরী কী মূর্তি ধরত কে জানে! কিন্তু আছে ওটি। তাই সবাই এত রামরাজত্বে আছে, আর আদিনাথেরও বুকের বল আছে।

শুধু ছেলের রোজগার হলে—

কিন্তু কোথায় সেই রোজগারটা? সেটাই যে হঠাৎ একটা শূন্য গহ্বর হয়ে মৌন দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে ভয়ঙ্কর গহ্বরের সম্ভাবনা নিয়ে।

মাধুরীর এই বিরক্তিকর ভারগ্রস্ত জীবনেও একটা ছন্দ ছিল। কিন্তু সে ছন্দটুকু ভেঙে গেছে। পুরো দুটি তিনটি মাস চাকরি ঘুচিয়ে বসে আছে দেবনাথ।

কথাটা অবিশ্বাস্য, দেবনাথের চাকরিটা যে কাঁচা ছিল, এমন কথা তো শোনা যায়নি কোনদিন! কিন্তু ছিল কাঁচা, সেটা দেবনাথ এযাবৎ কাল চেপে এসেছিল। এগার বছরের চাকরিও যে কাঁচা থাকতে পারে, এটা কারুর ধারণাতেও আসেনি কখনো।

কিন্তু সেই ধারণাতীত ব্যাপারটা ঘটল। ডামাডোলের বাজারে অফিসের দেহ সঙ্কুচিত করে নিতে ছাঁটাইয়ের করাত চলল, দেবনাথ সেই করাতের নিচে পড়ে গেল।

প্রথম দু-চারদিন কাউকে কিছু বলেনি দেবনাথ। মাধুরীকেও না। একটা অবাস্তব আশা নিয়ে ফের মান্থলী টিকিট কিনে কলকাতায়

যাওয়া-আসা করেছে। আর অফিসপাড়ায় ঘুরেছে ভাগ্যের পুনর্বাসনের আশায়।

কিন্তু চাকরি তো আর ছেলের হাতের মোয়া নয়! ঘুরে ঘুরে তামার মূর্তি রং আর রুক্ষ শুকনো চেহারা হয়ে গেল। মাধুরী চেপে ধরলো, তোমার কি হয়েছে বল?

আর চাপা গেল না।

তাছাড়া—চাপবেই বা কি? মাসের শেষে মাইনেটার প্রশ্ন উঠবে না?

একটা মাসের মাইনে দিয়ে কোম্পানী বিদায় দিয়েছিল। দেবনাথ ভেবে রেখেছিল প্রথমবারটা পকেট মারা গেছে বলে মৃতকল্প হয়ে এসে শুয়ে পড়বে, দুঃখের অভিনয় করবে, তারপর যা হয় হবে।

অভিনয়ের রিহার্সালও দিয়েছে মনে মনে, অসাবধানে তুলে নিয়েছে বললে লোকের কাছে হেয় হতে হবে, সহানুভূতি পাওয়া যাবে না, অতএব বলতে হবে গোটা তিন-চার চোঙা প্যাণ্ট ছেলে ঘেরাও করে ছুরি দেখিয়ে কেড়ে নিয়েছে।

কিন্তু ওসব আর বলা হল না, মাধুরীর জেরার মুখে আসল কথা ফাঁস হয়ে গেল। তারপরও অবশ্য ব্যাপারটা লুকনোই থাকল। শুধু সেটা একজনের মধ্যে না থেকে দু'জনের মধ্যে থাকল। জ্বালাটা ভাগ হয়ে গেল। তবে সমান ভাগে ভাগ হলো কি? মাধুরীর ভাগে তো বারো আনাই এসে পড়ল।

মাধুরীকে এই সংসারটি টানতে হবে, মাধুরীকে আদিনাথের কাছে ঘটনাটা চাপতে হবে।

দুটি কাজই যে কি ভয়ঙ্কর, তা মাধুরীই জানে।

অথচ দিনে দিনে দিন যাচ্ছে, এবং দুটো কাজই চালিয়ে যাচ্ছে মাধুরী।

কিছু টাকা দেবনাথ পাবে সত্যি। কিন্তু সে তো এখন বিশ বাঁও জলে। কোম্পানীর ঘর থেকে টাকা বার করা তো চারটিখানি কথা নয়!

অতএব চিরকেলে ব্যবস্থা।

সময়ের আভরণ, অসময়ের পেটভরণ, গয়নায় হাত।

কিন্তু সে আর কতটুকু?

দেবনাথের স্ত্রীর গায়ে কত সোনা থাকা সম্ভব?

আচ্ছা, আদিনাথের পেন্সনটা?

সেটা অবশ্য যথানিয়মে পাওয়া যাচ্ছে, পাড়ার একটি ছেলে ওইখানেই কোথায় কাজ করে, সে আদিনাথকে সঙ্গে করে নিয়ে যায়। আদিনাথ চেহারাটা দেখান, টিপসই দেন, টাকাটা নিয়ে আসেন।

না, এখন আর লেখার সইতে কাজ হয় না আদিনাথের। আন্দাজি আন্দাজি করতে পারলেও না।

তা সে টাকার প্রায় সবটুকুই যায় আদিনাথের ভোগে। আদিনাথের নৈবেদ্যয় তো এতটুকু তারতম্য করা চলবে না। তা হলেই তো সন্দেহ করতে শুরু করবেন আদিনাথ একটা কিছু ঘটেছে কোথাও।

অতএব মাধুরীরা তিনটি প্রাণী দৈনন্দিনের ন্যূনতম প্রয়োজনটুকুও মেটাতে পারছে না, অথচ আদিনাথের সব ঠিকঠাক চলছে।

হ্যাঁ, ক্রমে ছেলেকেও দলে টানতে হয়েছে মাধুরীদের, তা নইলে সাজানো স্টেজ ভেঙে ভেস্তে যেত।

একসময় মাধুরী ছেলেকে 'পাকা বুড়ো' বলে গাল পেড়েছে। এখন সেই বুড়োমিটুকুই বাঁচাচ্ছে তাকে। সুবলও তাদের নাটকের একটি নায়ক হয়ে গেছে।

সুবল জানে তার বাবার চাকরি চলে গেছে, তাই টাকা নেই। কাজে-কাজেই কিছু চাইতে নেই, চুপিচুপি শুধু ভাতটাত খেয়ে নিতে হয়, আর কার্উকে বলতে নেই যে বাবার চাকরি চলে গেছে।

এমন কি দাহ্কেও না।

সুবল জানে বাবা দাহ্কে শুনিয়ে শুনিয়ে আপিস যাওয়ার মতো কথা বলে, আর এমনভাবে 'বাবা বেরোচ্ছি' বলে ঠিক সাড়ে আটটার সময় বেরিয়ে যায়, যাতে দাহ্ ধরতেই পারে না কিছু।

কিন্তু তার পরেই বাবা রান্নাঘরের পিছনের দরজা দিয়ে চুপিচুপি

এসে ঘরে ঢুকে পড়ে, আর ইশারায় সুবলকে বলে চুপ!

সুবলকে এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গী করায় বেশ একটি রস পেয়ে গেছে সুবল। যেন এ বেশ একটা মজার খেলা।

তাই ক্রমশঃ সুবলকে আর শিখিয়ে দিতেও হয় না। আদিনাথ যখন ডাক দিয়ে বলেন, হ্যাঁ রে সুবল, বাবা ওঠেনি?

সুবল বলে, হ্যাঁ তো। বাবা চান করতে গেছে।

সুবল জানে দাদু যখন ডাক পাড়বেন, বৌমা, দেবুর কোন সাড়া পাচ্ছি না কেন, তৈরী হচ্ছে না? তখন চেঁচিয়ে বলতে হবে, বাবা, দাদু তোমায় ডাকছেন।

আদিনাথ তাড়াতাড়ি বলবেন—না না ডাকিনি, বাবার দেরি হয়ে যাচ্ছে তাই বলছি—

তখন দেবনাথ ঘর থেকে সাড়া দেবে, এই যে বেরোচ্ছি।

আদিনাথ যদি অবাক হয়ে বলেন, খাওয়া হয়ে গেছে তোর?

দেবুর আগেই সুবল বলে উঠবে, কখো—ন, সেই তুমি যখন বাগানে ছিলে—

আদিনাথ একটু যেন আশ্চর্য হন, বলেন—তা অত শীগগিরই বা খেলো কেন? রান্না-টান্না হয়েছিল?

সুবল বলে, সব—সমস্ত।

কিন্তু আদিনাথের কেমন যেন সন্দেহ হয়। রান্নাঘরে তেমন সাড়া-শব্দ পেলেন কই! ভাত ফোটার গন্ধই বা বেরল কখন!

মুড়ির গ্রাস মুখে পুরতে পুরতে আদিনাথ ডাক দেন, বৌমা, দেবুকে কেন ভাতের সঙ্গে এই ফুলুরি গোটাকতক দিলে না? খাসা ঝাল-ঝাল নুন-নুন হয়েছিল!

মাধুরী শান্ত গলায় বলে, ওসব আপনার ছেলের একেবারে সহ্য হয় না জানেনই তো।

আদিনাথ আপন মনে বলেন, দুখানা খেলে আর এত কিছু হত না। ভয়ে ভয়েই আরও পেটের রোগ জন্মিয়ে ফেলল। ওর বয়সে আমরা লোহা খেয়ে হজম করেছি বৌমা!

বৌমার সবই মনে মনে, সেই মনে মনেই বলে, সে তো এখনও পারছেন। এমনিতে মুখে বলে, তা আপনার মতো স্বাস্থ্য আর ছেলে পেয়েছে কই ?

এই জবাবে আদিনাথ একটু অপ্রতিভ হন, আবার সেই সঙ্গেই উদ্দীপ্ত হয়ে বলেন, আমার চেষ্টা ছিল বৌমা, কিন্তু আমি চেষ্টা করলে কী হবে ? মা-টি যে ছিল জন্ম-রুগ্ন ! জীওল মাছের ঝোল-ভাত ছাড়া কখনও কোন ভালমন্দ খেতে পায়নি।

মাধুরী যথারীতি মনে মনে বলে, আপনার আবহাওয়ায় যে থাকবে, তারই ওই দশা হবে। আপনার গ্রহ-নক্ষত্রই ওই।

কিন্তু লুকোচুরি করাটা ক্রমশঃই দুরূহ হয়ে উঠেছে। হঠাৎ হঠাৎ একদিন আদিনাথ জিজ্ঞেস করে বসেন, দেবু কি আপিস যায়নি বৌমা ? গলা পেলাম যেন ?

যায়নি প্রশ্ন করাটা অসঙ্গতই হয় আদিনাথের, কারণ যথাসময়েই তো 'বাবা বেরোচ্ছি' বলে চলে গেছে দেবনাথ।

কিন্তু গলাটা যখন শোনাই হয়ে গেছে, তখন অন্য কথা বানাতে হবে। বলতে হবে, বেরিয়ে ছিলেন, শরীরটা খারাপ লাগছে বলে চলে এসে শুয়ে পড়েছেন।

অ্যাঁ, সে কি ! শরীর খারাপ মানে ?

এ আবার উল্টো বিপদ !

আদিনাথকে শরীর খারাপের মানে বোঝাতে মাধুরীর ঘাম ছুটে যায়।

আদিনাথ তড়বড় করে ছেলের ঘরে ঢুকে পড়েন, অসহায় গলায় বলেন, জ্বর এল নাকি দেবু ?

দেবু তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে বলে, না না, এমনি মাথাটা একটু ধরেছে, আর ইয়ে—পেটটাও তেমন ভাল নেই।

আদিনাথ অসন্তুষ্ট স্বরে বলেন, পেটই যে তোমার কিসে খারাপ হয় তা জানি না। খাও তো রুগীর পথ্যি। ওষুধপত্তর কিছু খেলে ?

দেবু অম্লান বদনে বলে, হ্যাঁ, খেলাম।

নিজে থেকে আবার কি খেলে! একবার বিহারীর ওখানে গেলে হত না!

দরকার বুঝি তো যাব বাবা।

তোমাদের আবার বোঝাবুঝি! বোঝ খালি উপোস করতে। জান উপোস করলেই সব ঠিক হয়ে যায়। সাবধানে থেকো। বলে বাইরে এসে ডাক দেন, সুবল ইস্কুল গেছে বৌমা?

গেছে।

মাধুরীর কথাবার্তা ক্রমশঃই সংক্ষিপ্ত হয়ে আসছে।

কিন্তু আদিনাথের যে শব্দের মধ্যেই সমগ্র পৃথিবী। আদিনাথ অমন সংক্ষিপ্তে সন্তুষ্ট থাকবেন কি করে? আদিনাথ তাই কথা ফাঁদেন বিহারী ডাক্তারের, বুঝলে বৌমা, ভিজিট না নিয়েও পয়সার কমতি নেই। আজকাল আবার নাকি ওষুধের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে!

মাধুরী আস্তে বলে, তাই বুঝি?

তাই তো কথা। তবে ওষুধটা ভাল। দেবু যদি একবার ওর হাতে পড়ত, ঠিক সেরে যেত।

মাধুরী বলে, বাবা আপনার তেলটা দিই?

তেল! হ্যাঁ হ্যাঁ, দেবে বৈকি। বেলা হয়ে গেছে।

একবেলার রান্নার তেল ডলে ডলে গায়ে মাখেন আদিনাথ, স্বাস্থ্য-সম্পন্ন দেহখানা যেন পালিশ হতে থাকে, মাধুরী কেমন একটা জ্বালা-ভরা চোখে সেইদিকে তাকিয়ে থাকে।

খেতে বসে আদিনাথ বলেন, আমাকে তিন-তিনখানা মাছ দিয়েছ বৌমা, ঝালে, ঝোলে, ভাজায়—তোমাদের রেখেছ?

মাধুরী বলে, রাখব না কেন!

না, তাই বলছি।

বলে নীরবে খেতে থাকেন আদিনাথ।

মাধুরী মাঝখানে একবার টুক করে ঘরে ঢোকে। দেবনাথ

চুপিচুপি বলে, বাবা কি কিছু সন্দেহ করছেন মনে হচ্ছে ?

সন্দেহ করতে যাবেন কেন ?

ওই যে কি তোমাদের মাছ রাখার কথা বলছিলেন ?

ওরকম উনি রোজই বলে থাকেন। মাধুরী একটু তিক্ত হাসি হেসে বলে, বলেন, আবার শেষ পাতে নতুন করে চেয়েও নেন।

কথার সুরটা দেবনাথের ভাল লাগে না, সেও বলে ওঠে, তবু তো ছেলের রোজগারে খেতে হল না কোনদিন, এখনো নিজের পয়সায় খাচ্ছেন।

মাধুরী মুখ লাল করে চলে যায়।

কিন্তু শুধু শুধু মান্থলী টিকিট কেটে ডেলি-প্যাসেঞ্জারীর ভান আর কতদিন চালানো যায় ? টাকাই বা আসে কোথা থেকে ? কলকাতার রাস্তায় ঘুরে বেড়ালেই তো চাকরি জুটবে না ? তার থেকে বদন দাসের চায়ের দোকানে বসে খবরের কাগজখানা উল্টে উল্টে কর্মখালির পাতা দেখায় কাজ আছে।

বদন দাস ওই একটি ভাল বিজ্ঞাপন ঠিক করেছে দোকানের, ইংরিজি বাংলায় মিলে চারখানা কাগজ রাখে দোকানে। তুমি আনন্দবাজার পড়বে তো পড়, বসুমতী পড়তে চাও, তাও আছে। আর স্টেটসম্যানের ভক্তরা চলে এস এখানে, অমৃতবাজারের ভক্তও এস। এইখরচাটাকেবদন দাস দোকানের ন্যায্য খরচের মধ্যে রেখেছে। কোন ভদ্রলোকটা কাগজ পড়বে অথচ চা না খেয়ে চলে যাবে ? চায়ের কোয়ালিটি নিয়ে কোন সমালোচনা উঠলেই বদন তার দোকানের ছেলেটাকে ঘাড় ধরে ঠেলে রাস্তায় বার করে দেয়। যদিও পরদিন আবার তাকেই চা পরিবেশনে দেখতে পাওয়া যায়।

বদন বলে, কেঁদেকেটে মাপ চাইল ছোঁড়া, না করতে পারলাম না, বুঝলেন ? তবে খুব টাইট দিয়ে দিয়েছি।

ভেতরের রহস্য সবাই জানে, সবাই মনে মনে হাসে, তবু মেনেও নেয়। চার-চারখানা খবরের কাগজ নাড়তে পাওয়া তো সোজা সুখ নয়!

ওদিকে বদন দাস ওই কাগজ থেকে আরও একটা ব্যবসা চালায়, সেটা হচ্ছে ঠোঙা বানানো, বদনের বিধবা দিদি ঘরে বসে সেই কাজটি করে।

মোট কথা, বদনের লোকসান ছাড়াই তার চায়ের দোকানের খদ্দেরদের লাভ হয়।

দু'তিনদিন দেখার পরই বদন দাস সন্দেহের গলায় বলে, দাদাবাবুর কি শরীর ভাল নেই? ট্রেন ধরতে ছুট দিতে দেখছি না?

দেবনাথ জবাব প্রস্তুত করেই রেখেছিল, হাতের কাগজখানা পাট করতে করতে বলে, শাপে বর হয়েছে বদন, গোটাকতক দিন জিরিয়ে বাঁচব। অফিসে স্ট্রাইক—

স্ট্রাইক! বদন আঁতকে উঠে বলে, সর্বনাশ! তাহলে তো এখন বিশ বাঁও জল!

দেবনাথ বলে, তা বলেছো ঠিকই। তবে আমাদের ক'জনের তত ভয় নেই। আমরা তো ইউনিয়নে নেই। তাছাড়া কোন দিনই কোন সাতে-পাঁচে নেই।

আজ্ঞে হ্যাঁ, সে তো বরাবরই দেখছি—বদন হৃষ্টগলায় বলে, চিরদিনের শান্ত ছেলে। তবে কি, কথা হচ্ছে বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। কোথাকার জল কোথায় গড়ায়—

সে কথা ঠিক।

বলে উঠে পড়ে দেবনাথ বেশ অন্তরঙ্গ সুরে বলে, তা শোন, বাবাকে এখনও বলিনি কথাটা। মানে চোখে দেখেন না, অনর্থক হাঁকপাঁক করবেন, ধীরেসুস্থে বলব। তুমি যেন এখুনি চট করে গল্প করো না।।

না না। আমার কি দরকার?

দেবনাথ বলে, না, মানে বলায় দোষ কিছু নেই, তবে অনর্থক চিন্তায় ফেলায় লাভ কি? বয়েস হয়েছে—

বদন সহাস্যে বলে, বয়েস হয়েছে তা ঠিক, আর ওই চোখটাতেই জব্দ করে ফেলেছে, নচেৎ উনি এখনও আপনার আমার থেকে

জোয়ান। চোখে দেখেন না, তবু পা ফেলাটি দেখবেন। বড় বড় পায়ে চক্ষের নিমিষে এখান থেকে ওখান। স্বাস্থ্যশক্তিটা ভাল।

দেবনাথ এ কথায় একটু হাসির সায় দিয়ে চলে যায়।

সকলেই ওই এক কথা বলে, স্বাস্থ্য! আদিনাথের কী মজবুত স্বাস্থ্য! দেবনাথের মনে হয় এতে যেন নজর লাগছে বাবার। অথচ নিজেই সে যখন ঘরে শুয়ে পড়ে পড়ে বাবার চানের আগের গায়ে তেল-ডলাটি দেখে, কেমন একটা বিষণ্ণ ঈর্ষা অনুভব করে। এই স্বাস্থ্যের কিছুই পায়নি সে। যেন আদিনাথ নামের মানুষটা সংসারের কাছ থেকেও যেমন নিত্য আয়োজনের প্রায় সবটুকুই আত্মসাৎ করেন, তেমনি প্রকৃতির কাছ থেকেও এ বাড়ির স্বাস্থ্যের বরাদ্দর প্রায় সবটুকুই আত্মসাৎ করেছেন।

দেবনাথের ছেলেটা ল্যাকপেকে, বৌ বাঁশপাতার মতো, দেবনাথ নিজে এই, অথচ দেবনাথের আশী বছরের বাবার দীর্ঘ বলিষ্ঠ বিশাল মজবুত দেহখানা লোকের ঈর্ষার বস্তু।

মাধুরী বলে, হবে না কেন? জগন্নাথের মতো 'চৌষট্টি ভোগ' চালালে সকলেরই হয়!

কিন্তু সত্যিই কি তা হয়? ওই 'চৌষট্টি ভোগটা' ভোগের ক্ষমতা থাকা চাই না?

বাড়ি ঢুকতে গিয়ে দেবনাথ দেখল আদিনাথ আসছেন নাতির হাত ধরে ধরে।

সুবল চেঁচিয়ে সাড়া করছে, মা, আমায় ভাত দাও, ইস্কুলের বেলা হয়ে গেল। আর দাদুকে বলছে, আঃ দাদু, অমন তুমতুম করে এগিয়ে যাচ্ছো কেন? আমার সঙ্গে সঙ্গে আস্তে আস্তে হাঁটতে পার না?

আদিনাথ কেমন একটু ম্লান হাসি হেসে বলেন, আশী বছর ধরে তুমতুম করে এগিয়ে যাওয়াই অভ্যেস হয়ে গেছে, তোর তালে তাল

দেবার অভ্যেসটা কিছুতেই আর হচ্ছে না ভাই।

সুবল অবলীলায় বলল, তা এখন যখন চোখে দেখতে পাও না, তখন অভ্যেস করতে হবে।

দেবনাথের বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে।

ছেলেটা এত নিষ্ঠুরের মতো কথা শিখেছে কোথা থেকে?

তারপর ভাবল, ও শিশু, ওর কি বোধ আছে এটা নিষ্ঠুরতা!

তবু দেবনাথের মুখে আসছিল—'এই সুবল, ও কী অসভ্যের মতন কথা?' কিন্তু দেবনাথের মুখ খোলবার জো নেই, দেবনাথ একটু আগে অফিসে চলে গেছে।

বাবাকে দেখে সুবলের মুখে একটা কৌতুকের হাসি ফুটে উঠল। সুবল মুখে আঙ‍ুল ঠেকিয়ে নীরবতার ইশারা করে, একবার দাদুর দিকে দৃষ্টিপাত করে ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা নাড়ল। অর্থাৎ দাদু তোমার উপস্থিতিটা কাঁচকলা বুঝছে!

দেবনাথের বুকটা টনটন করে উঠল।

দেবনাথ আস্তে পাশ কাটিয়ে রান্নাঘরের পিছনের দরজার দিকে চলে গেল। কিন্তু দেবনাথকে থমকে দাঁড়াতে হল, শুনতে পেল বাবা বলছেন, কে ওখানে রে সুবল?

সুবল তার বাঁশীর মতো পাতলা টনটনে গলাটা দিব্যি তুলে বলল, কে আবার। স্বপ্ন দেখছো নাকি দাদু?

আদিনাথ বললেন, কি জানি মনে হল যেন কে পাশ দিয়ে চলে গেল।

বেরাল-টেরাল হবে বোধ হয়—বলে সুবল হাসি চাপতে খুক খুক করে কাশে।

আদিনাথ হঠাৎ সুবলের হাতটা ছেড়ে দিয়ে বলেন, তুই যা, ভাত খেগে যা। আমি এই বাইরেই একটু বসছি।

এই রোদ্দুরে বাইরে আবার কোথায় বসবে?

সুবলের গলায় অভিভাবকের সুর।

আদিনাথ হঠাৎ ধমকে ওঠেন।

বলেন, সব সময় সদ্দারী করতে আসিস নে, ছেলেমানুষ ছেলেমানুষের মতো থাক।

বেশ, ঘেমে নেয়ে যাও, আমার কী?

বলে সুবল চলে যায়।

আদিনাথ তাঁর চিরপরিচিত এই পরিবেশটার মধ্যেও কেমন একটু অসহায়ের মতো আস্তে পা ফেলে বাঁধানো বকুল গাছটার তলায় এসে বসেন।

আদিনাথের বাবার আমলের এই বাড়িটায় আদিনাথেরও কিছু কিছু অবদান আছে। রান্নাঘরটা ছিল উঠোন পার হয়ে একটা চালাঘর। বৃষ্টির সময় ভিজতে ভিজতে আসা-যাওয়া করতে হত। আদিনাথ বাড়ির মধ্যে দাওয়ার এক কোণ ঘিরে রান্নাঘর বানিয়ে দিয়েছিলেন। আদিনাথের মা ক্ষুব্ধ হাসি হেসে বলেছিলেন, মরণকালে জ্বরচ্ছেদ হল আমার। ঘাটের পাউড়িতে পা দিয়েছি, এখন আমার কোঠা রান্নাঘর, বিলিতি মাটির মেজে। যাক—বৌ সুখ করবে—

কিন্তু ভদ্রমহিলার ভবিষ্যৎবাণী ফলেনি। জন্মরুগ্ন বৌ কদিনই বা সে রান্নাঘরে রেঁধেছে! বিছানাতেই থেকেছে। বুড়ীকেই শেষ অবধি তিন হাঁটু এক করে রাঁধতে-বাড়তে হয়েছে। তখন অবশ্য তিনি বলেছেন, যাই ভাগ্যিস আদি আমার এইটি করে দিয়েছিল, তাই গড়িয়ে গড়িয়েও পারছি।

যাক সে-সব কোন্ অতীতের কথা!

সে কথা আদিনাথের স্মৃতির ভাঁড়ারে ধুলোচাপা হয়ে পড়ে আছে, আর সবাই ভুলে গেছে।

আদিনাথের আর একটি অবদান, এই বকুল গাছের গোড়া বাঁধানো। আদিনাথের যখন বাল্যকাল, আদিনাথের পিঠোপিঠি ছোট বোন টুনির সঙ্গে বকুলফুল কুড়োনোর পালা চলত। টুনি বলত, ছাখ্ দাদা, এই গাছের তলাটায় যদি ঘাসজঙ্গল না থেকে শান-বাঁধানো থাকত, কী মজাই হত! রাখালের মা ধুয়ে মুছে

সাফ করে রেখে দিত, আর যত ফুল পড়ত সব সেইখানে পড়ত। একটাও ফুল নষ্ট হত না।

আদিনাথের সেই কথাটি বড় মনে লেগেছিল। যদিও সেই বোন বিয়ে হয়ে গিন্নী হয়ে গিয়েছিল তখন, তবু আদিনাথ ওই গাছটার গোড়ায় অনেকটা বড় করে বেদী বানিয়ে দিয়েছিলেন। আদিনাথের মেয়ে দুটো ছিল নেহাত বাজে, ফুলটুলের ধার ধারত না। বকুলফুলের থেকে টোপাকুলের প্রতি অনেক বেশী আকর্ষণ ছিল তাদের। শিউলীফুল তুলত বটে, কিন্তু এনেই টাটকা ফুলগুলোর বোঁটা ছিঁড়তে বসত, শ্রীপঞ্চমীর দিনে পরবার জন্যে কাপড় ছোপাতে।

আদিনাথ হাঁ হাঁ করে বলতেন, আহা আহা, টাটকা ফুলগুলো কোন্ প্রাণে অমন করে ছিঁড়ছিস রে?

ওরা অম্লান মুখে বলত, টাটকা থাকতে থাকতে না ছিঁড়লে তাড়াতাড়ি ছেঁড়া যায় না বাবা!

তারপর ওরা সেই সাদা পাপড়িগুলো ওঁচলা ফেলার জায়গায় ফেলে দিয়ে বোঁটাগুলো কাঠফাটা রোদ্দুরে শুকোতে দিত।

আদিনাথ তাঁর মেয়েদের এরকম বন্যতায় দুঃখিত হতেন। আদিনাথের ছেলের বৌ আদিনাথের খাওয়াদাওয়া দেখে মনে মনে ওই শব্দটা উচ্চারণ করলেও, সত্যি বন্য নয় আদিনাথ। দেবনাথের মতই সভ্য সুকুমার মনটা ছিল তাঁর। হয়তো আজও আছে। কিন্তু একটা আশী বছরের লোকের মনের খবর কে রাখতে যায়! লোকটা যে এখনও পৃথিবীতে চরে খাচ্ছে, বিছানা সার না করে পৃথিবীর মাটিতে পা ফেলে ফেলে হাঁটছে, এটাই তো লোকের বিরক্তিকর বিস্ময়!

তাছাড়া—আদিনাথের এই বয়সেও খাওয়ার বহর, পাড়ার মধ্যে একটা প্রসঙ্গ।

বকুল গাছের বাঁধানো মূলটার একদা সেই চকচকে শানে এখন বড় বড় ফাটল ধরেছে, ধারের জায়গায় জায়গায় ভেঙে ইট বেরিয়ে

ঘাস গজিয়েছে, ফাটলের খাঁজে কাঠপিঁপড়ের বাসা, তবু আদিনাথ মাঝে মাঝে এখানে বসেন। মনটা হু-হু করলেই বসেন।

আজ ওই ছোট্ট ছেলেটার ধমকে মন হু-হু করে উঠল আদিনাথের। দৃষ্টিহীন চোখের কোণে জল জমে উঠল।

আদিনাথ আকাশের দিকে সেই অন্ধদৃষ্টি মেলে বসে যেন অতীতের সমুদ্রে ডুবে গেলেন।

যখন এই বেদীটা বাঁধাচ্ছেন, পাড়ার হিতৈষীরা আদিনাথের এই 'বাজে খরচে'র জন্যে হিতউপদেশ কম দেয়নি।

বৃথা ওই খরচাটা করছ কেন আদিনাথ, শুধু শ্যাল-কুকুরের ঘুমের জায়গা করে দিতে? নিজে কখন বসবে? বরং ওই খরচায় তুমি বাড়ির মধ্যে কিছু করে নিতে পারতে।

কিন্তু আদিনাথ সংকল্পচ্যুত হননি।

পরে অবশ্য দেখা গিয়েছিল, সকাল-বিকেল একটা আড্ডার জায়গা হয়েছিল এটা। সকালে ছোট ছেলেমেয়েগুলো বসত, ফুল কুড়িয়ে এনে ভাগ করত, মাঝে মাঝে রান্নাবান্না খেলাও করত, আর বিকেলে ওই হিতৈষীরাই একে একে এসে বসতেন হুঁকো হাতে।

আদিনাথের তখন লোহার শরীর।

ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করেন, আর কলকাতা থেকে ফেরার সময় প্রায় প্রত্যহই দু'হাতে বাজার বয়ে নিয়ে আসেন। আদিনাথের চাকরিতে 'উপরি' ছিল, যেটা তখনকার দিনে লোকে নিন্দনীয় মনে না করে ভাগ্যের ব্যাপার বলেই মনে করত।

পরে অবিশ্যি আদিনাথ 'বড়বাবু' হয়েছিলেন। তবে 'উপরি'টা বরাবরই ছিল।

আদিনাথ ওই আকাশের গায়ে যেন সেই ফেলে-আসা দিনগুলোর ছবি দেখতে পান।

বাজার করে ফিরতেন বলে রোজই দেরি হত আদিনাথের, তবু বাড়ি ঢুকবার মুখেই দেখতে পেতেন দু-চারজন বৃদ্ধ তখনও বসে বসে তামাক টানছেন এবং সংসারের সুখদুঃখ অথবা পাড়ার লোকের

হাঁড়ির খবরের আলোচনা করছেন।

আদিনাথকে দেখে একটু নড়েচড়ে বসে বলতেন তাঁরা, এই যে আদিনাথ এলে! তোমার বাবা রোজই দেরি!

আদিনাথ সৌজন্যের হাসি হেসে বলতেন, এই একটু ঘুরেটুরে আসি তো—

ওঁরা বলতেন, তোমায় তখন মানা করেছি বটে, তবে এখন দেখছি জায়গাটি বড় মনোরম হয়েছে আদিনাথ। তা তোমার গিয়ে আমরাই ভোগ করছি।

আদিনাথ সেই দু'হাতে থলির ভার সামলেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটু কথা বলতেন। বলতেন, আমার ভাগ্য। আপনাদের পায়ের ধুলো পড়ে—

ওঁরা হেসে বলতেন, তা শ্যাল-কুকুরের আড্ডার থেকে ভালই হয়েছে, কী বল? আর তোমার বাড়ির সদর পাহারা দেওয়াও হচ্ছে।

অতঃপর ওঁরা আসল কথা পাড়তেন, যার জন্যে এতক্ষণ বসে থাকা—

রোজই তো বাজার বয়ে সারা! তোমার সংসারে এত কে আছে হে?

আদিনাথ আসল প্রশ্নটা এড়িয়ে সবিনয়ে বলতেন, এই ওদিক থেকে একটু সুবিধে-টুবিধে হয়—

সুবিধে হয়? তবে আমাদের ছেলেগুলো যে বলে কলকাতার বাজার আগুন!

সে জায়গা বিশেষে। শ্যালদা, মানিকতলা এসব দিকে সস্তা।

অ! তা কি আনলে আজ?

আদিনাথের এক হাতে মাছটা প্রায় থাকতই, অন্য হাতে স্পর্শদোষ বাঁচিয়ে তরিতরকারী। ফুলকপি, বাঁধাকপি, মটরশুঁটি, অসময়ের পটল, মাঝে মাঝে কমলালেবু, মর্তমান কলা।

এসব মায়ের জন্যে।

পাড়ার ওঁদের কাছে সবটা খুলে বলতেন না আদিনাথ। বললেন,

অথচ অসময়ের ভাল জিনিস একা খেলেন, কাউকে একটু ভাগ দিলেন না, এটা অস্বস্তিকর। অথচ এতগুলি লোককে কত আর দিতে পারবেন! কাকে রেখে কাকেই বা দেবেন!

তাই যেন অগ্রাহ্যভরে বলতেন, এই দুটো কপি-টপি নিয়ে নিলাম, এখানে তো বাজার করার লোক নেই. তাছাড়া মা নৈনিতাল আলুটা বড় পছন্দ করেন—

এ হাতে বুঝি মাছ?

ইলিশের জোড়া লুকনো যায় না, বড় গলদাচিংড়ি গেপে ফেলা যায় না। আদিনাথ কুণ্ঠিত হাসি হেসে বলতেন, হ্যাঁ, ইয়ে—মাছটা একটু ভালবাসি, তা সকালে তো আর তেমন জুৎ করে খাওয়া হয় না—

কথাটা অবশ্য সত্যি নয়।

সকাল সাতটার সময়ই আদিনাথ যেভাবে গুছিয়ে রাতের রান্না মাছ আর পঞ্চব্যঞ্জন দিয়ে খেতেন, তা দেখে তাক লাগবার মতো।

মাছটা আদিনাথের মা ছুঁতেন না, দেবনাথের মাকেই রাঁধতে হত। তবে কুটে বেছে দিতেন আদিনাথ নিজেই।

ওঁদের কবলমুক্ত হয়ে আদিনাথ বাড়ি ঢুকেই ডাক দিতেন—মা!

মা হয়তো তখন হরিনামের মালা জপতেন দাওয়ায় বসে বসে। হরিভক্তির প্রাবল্যে নয়, ছেলে আসবার প্রতীক্ষায় বসেই তো থাকবেন, তবে বসে না থাকি ব্যাগার খাটি!

মার সেই প্রতীক্ষারত মূর্তিটি মনে পড়ল আদিনাথের। ছেলের সাড়া পাওয়া মাত্রই হাতের মালা কপালে ছুঁইয়ে বলতেন, আদু এলি? রোজই তোর দেরি। পাড়ার সকলে এসে গেল।

আদিনাথ হেসে বলতেন, পাড়ার সকলে খালি হাত ঝাড়া দিয়ে আসে, বাজারের দিকে তো যায় না—

তা আদিনাথের মা জিনিসপত্র ভালবাসতেন। কম বয়সে নিয়ত অভাবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছে বলে বস্তু সম্পর্কে বিশেষ একটি মোহ ছিল তাঁর।

অবশ্য মুখে বলতেন, ওই তো! ওই বাতিকেই—

তারপর ডাক দিতেন, বৌমা, চুপড়ি-টুপড়িগুলো নিয়ে এস—

বৌমা আস্তে আস্তে এসে দাঁড়াত ঝুড়ি চুপড়ি নিয়ে। শাশুড়ী বলতেন, লণ্ঠনটা একটু বাড়াও তো, জিনিসগুলোর চেহারাটা দেখে নিই।

আদিনাথের স্ত্রী হ্যারিকেন বাড়িয়ে, একটি একটি করে শাশুড়ীকে সব দেখিয়ে ঘরে তুলত। আর সেই সময় আদিনাথ একটু কুণ্ঠিত গলায় বলতেন, বলছিলাম কি—দীনুকাকার আর ঘোষালকাকার বাড়িতে চারখানা করে মাছ আর আধখানা করে কপি পাঠিয়ে দিলে ভাল হত—

আদিনাথের স্ত্রীর ভাবটিতে কোন ভাব ফুটে উঠত না। আদিনাথের মা অসন্তুষ্ট গলায় বলতেন, রোজ তোমার ওই এক কথা! বিনি মাগনায় পাওয়া জিনিস? তাই দান-ছত্তর খুলেছিস? পয়সা দিয়ে কিনে এনে নিত্যিদ্দিন আবার পাড়ায় বিলোনো কী? বলে লোকে কুটুমবাড়ির তত্ত্বর জিনিসই প্রাণ ধরে ভাল করে দিতে পারে না—

আদিনাথ বলতেন, হোক গে মা। চোখের সামনে দেখলেন।

দেখবার জন্যেই তো চোখ পেতে বসে থাকেন।

বলে মা গজগজ করতে করতে বলেন, বঁটি আর কপি আমার সামনে এনে ভাগ কর বৌমা। তুমি তো আবার দাতার বেটি, হয়তো বেশীখানাই দিয়ে আসবে।

দিয়ে অবিশ্যি বৌমা আসত না, সে রান্নাঘরের পিছনের ওই দরজাটায় দাঁড়াত—মেয়েরা কেউ দিয়ে আসত।

সমারোহের খাওয়াদাওয়ার পর অনেক রাত্রে এই বকুলতলায় এসে বসতেন আদিনাথ। তখন আদিনাথের মধ্যেকার ওই আহার-লোলুপ স্থূল প্রকৃতির মানুষটা যেন কোথায় হারিয়ে যেত, আদিনাথ আকাশ দেখতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আকাশের মধ্যে যে

কী খুঁজে পেতেন তিনি কে জানে!

এখন মাঝে মাঝে এ সন্দেহও হয় আদিনাথের, ঘাড় তুলে ওই অতক্ষণ আকাশ দেখে দেখেই হয়তো তাঁর চোখে কোন ব্যাধি জন্মে গিয়েছিল। বেহারী ডাক্তার অবশ্য আদিনাথের এ সন্দেহ উড়িয়ে দেয়, বলে, না না। আকাশপানে তাকিয়ে থাকলে বরং চোখ পরিষ্কার হয়।

তবু আদিনাথের সন্দেহ ঘোচে না।

এখনও আদিনাথ আকাশপানে তাকিয়ে থাকেন। আর ওই প্রশ্নটারই উত্তর খোঁজেন।

এখন অবশ্য রাত্রে এসে বসেন না।

ওরা বসতে দেয় না।

দিনেই বসেন। আর ক্ষুব্ধ হাসি হেসে হেসে বলেন, অন্ধের কিবা রাত্রি কিবা দিন দেবু!

তখন 'ভয়' বলে কোন শব্দ ছিল না আদিনাথের জীবনে। কত রাত অবধি বাইরে বসে থাকতেন। কুকুর এলে 'হেই' করতেন এই পর্যন্ত।

দেরি করার আরও একটা কারণ ছিল, মা যতক্ষণ না ঘুমোবেন, বৌ তো শুতে আসবে না। একা একা ঘরে শুয়ে পড়ে থাকার চেয়ে বাইরে হাওয়ায় বসে থাকতে অনেক ভাল লাগত।

কখনও কখনও বাতাস বেশী উঠত, কোথা থেকে আগাছা জঙ্গলের যেন বুনো বুনো গন্ধের সঙ্গে চেনা ফুলের গন্ধ ভেসে আসত, আদিনাথের মনে হত যেন ভাগ্যের আর ভগবানের দয়ার স্পর্শ পাচ্ছেন।

আদিনাথ নিজেকে ভারী সুখী বলে অনুভব করতেন। আদিনাথের পরিমণ্ডলে যেন একটি আহ্লাদ আর প্রসন্নতা বিরাজ করত।

অফিসেও বলত সবাই, আদিনাথদা একাই একশো।

বলত, চাটুয্যেদা যতক্ষণ না আসেন অফিস কানা হয়ে বসে থাকে।

অথচ সেই আদিনাথ এখন নিজেই কানা হয়ে বসে আছেন।

কোন-কোনদিন যখন উঠি-উঠি করছেন, তখন বৌ এসে বসত।

আদিনাথ বলতেন, আমি চল্‌তি পথে, আর এতক্ষণে আসা হল?

বৌ অভিমানভরে বলত, কী করব? মা ঘুমোবেন তবে তো! সুবিধে আছে?

আদিনাথ সেকালের ছেলে। আদিনাথ এই বিরাট অসুবিধের কথাটা অস্বীকার করতে পারতেন না। যত রাতই হোক, স্বামীর সঙ্গে খোলা জায়গায় বসাটা তখনকার দিনে গর্হিত বলেই গণ্য হত। এই আসাটা শাশুড়ীর অগোচরে।

তাও ভয়ে কাঁটা হয়ে। ছেলেমেয়েরা যদি হঠাৎ উঠে পড়ে আবিষ্কার করে মা ঘরে নেই, তাহলেও তো সর্বনাশ! প্রায় অভিসারের মনোভাব নিয়েই স্বামীর কাছে এসে একটু বসা।

আদিনাথ বলতেন, তাহলে আর একটু বসি। এতক্ষণ আকাশ দেখছিলাম, বেশ লাগছিল।

বৌ হয়তো হেসে বলত, তুমি আকাশ দেখ, আর আমি রাত-দিন পাতাল দেখি।

কেন? পাতাল দেখতে যাবে কেন?

'যাবে কেন' সেকথা বলতে গেলে গুরুজনের সমালোচনা করতে হয়। তাই বৌ বলত, আহা, ঠাট্টা বোঝ না!

তারপর বলত, আঃ, ভগবানের রাজ্যে এত হাওয়া, খেতে পাই না!

আদিনাথ কৌতুক করে বলতেন, তুমি তো হাওয়া খেয়েই থাক।

বৌ বলত, ওষুধে সেটা পুষিয়ে নিই।

আদিনাথ ক্ষুণ্ণভাবে বলতেন, টাটকা ইলিশ একখানাও খেলে না?

খেয়ে মরবো তো।

লোভে পড়ে আনি, আনতে ইচ্ছে করে না।

বৌ ব্যাকুলভাবে বলে, কী যে বল! আমায় ভগবান বঞ্চিত করেছেন, তা বলে তুমি খাবে না? তুমি খেলেই আমার খাওয়া।

আদিনাথ মাঝে মাঝে ভাবেন, এখনো বেঁচে থাকলেও থাকতে পারত মানুষটা। আর পারবে নাই বা কেন? আমিই যখন রয়েছি, তার থেকে পুরো দশটি বছরের বড়! হয়তো এখনকার ভাল ভাল ওষুধে পেটটা তার ভালও হয়ে যেতে পারত। সেই মানুষটার যত্ন, সে এক আলাদা জিনিস।

ক্ষমতা ছিল না, তবু যেন সবটা ভরাট করে রাখত। অবিশ্যি এখন সেই স্বাদটা প্রায় ভুলেই গেছেন। তবু এইরকম এক-একদিন যখন চুপচাপ বসে থাকেন, সেই রোগা ক্ষীণজীবী মানুষটার কথা মনে পড়ে যায়।

আর একটুখানি বসে থেকে আদিনাথ বলতেন, চল, ওঠা যাক।

বৌ বলত, আমার একদিন সারারাত এখানে শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। এখানেই ঘুমোই বিছানা এনে।

বকুল গাছ থেকে ভূত নেমে এসে তুলে নিয়ে যাবে।

বৌ বলত, তুমি তো বসে থেকে পাহারা দেবে।

ভূতের সঙ্গে পারব আমি?

খুব পারবে, ভূত তোমায় দেখে কাছে আসতে সাহসই পাবে না। দু'হাতে দুটোকে ধরে আছাড় মেরে শেষ করে দেবে।

বৌ নিজে ক্ষীণ বলে ওই লোহার মতো শরীর শক্তিমান পুরুষটাকে খুব একটা সমীহের চোখে দেখত।

আর আজ?

আজ আদিনাথকে সুবলের হাত ধরে পথ চলতে হয়।

তবু আদিনাথ সুখীই ছিলেন।

সুখী থাকবার আশ্চর্য একটা ক্ষমতা আছে তাঁর আজীবন। কিন্তু আজকাল যেন ভিতর থেকে একটা হাহাকার ওঠে।

মনে হয় আর কিছু নেই, আর কোথাও কিছু পাবার নেই। এই পৃথিবীটা হারিয়ে গেছে আদিনাথের মুঠো থেকে ফসকে।…পৃথিবীর

রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শ এর একটা মাত্রই হারিয়েছেন, রূপের ঘরের দরজাটাতেই শুধু চাবি পড়ে গেছে, তবু যেন সবগুলোই পালিয়ে বেড়ায়।

উঁকি মারে, ধরা দেয় না।

স্পর্শের মধ্যেই সব থেকে স্বাদ, কিন্তু তাই বা দিচ্ছে কে? মানুষের গায়ে হাত বুলিয়ে দেখলে তারা যেন রীতিমত বিরক্তই হয়। জিনিসের গায়ে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে অনুভবের মধ্যে পাওয়া গেলেও যেন তার প্রাণটা খুঁজে পাওয়া যায় না।

তবু ওই প্রাণহীন অনুভূতির দরজাতেই তো মাথা খোঁড়া।

আজকাল আবার আর একটা ব্যাপার লক্ষ্য করছেন আদিনাথ, সর্বদাই মনে হয়, কে যেন আশপাশ দিয়ে চলে গেল, কারা যেন ফিসফিস করে কথা বলছে, কোথায় যেন কে কৌতুকের হাসি হাসছে, আর আদিনাথের বিরুদ্ধে যেন কী এক গোপন ষড়যন্ত্র করছে।

মানুষের উপস্থিতি তিনি অনুভব করতে পারেন, ঠিক বোঝেন কেউ আছে ধারে-কাছে, হঠাৎ হঠাৎ যেন দেবনাথের আভাস পান। কিন্তু ওরা কেউ তা স্বীকার করে না। বলে, কই, কেউ তো নেই।

সুবল আবার হেসে হেসে বলে, দাদু আর-জন্মে তুমি বুঝি বাঘ ছিলে? তাই হাঁউমাউখাঁউ মানুষের গন্ধ পাঁউ?

বুঝতে পারে না, কোন্ কথাটায় দাদুর মনে কী প্রতিক্রিয়া হয়।

তবু ওই ছোট্ট মানুষটার মাধ্যমেই আদিনাথের পৃথিবীর সঙ্গে সংযোগ। সন্ধ্যেবেলা বই-শেলেটের হাত থেকে পালিয়ে এসে দাদুর কাছে শুয়ে পড়ে দাদুর গায়ে হাত এবং পা দুই বিনা দ্বিধায় তুলে দিয়ে জড়িয়ে ধরে বলে, দাদু, তোমার পিঠটা না একটা গদির মতন! তুমি যদি উপুড় হয়ে শুয়ে থাক, আমি দিব্যি ঘুমিয়ে পড়তে পারি।

আদিনাথ কৃতার্থ হয়ে যান।

আদিনাথ ওই তাজা শরীরটার ঘ্রাণ থেকে পৃথিবীর ঘ্রাণ পান।

আদিনাথ ভয়ে ভয়ে বলেন, পড়া শেষ করে এসেছিস তো দাহু? মা বকবে না তো?

সুবল অবহেলায় বলে, মা তো সব সময় বকে।

না না, তবু পড়াটা করে আসা ভাল।

বলেন, 'পড়া' বস্তুটার প্রতি সমীহবশতঃ নয়, জানেন পড়া না করে এলে সেই ছুতোয় মাধুরী টেনে নিয়ে যাবে। আর তারপর এমন কব্জা করে ফেলবে যে রাত্তিরের মধ্যে আর এমুখো হতে দেবে না।

অথচ আদিনাথের সমস্ত লোমকূপগুলো পর্যন্ত তৃষ্ণার জলের স্বাদ পায় ওই ছেলেটার সঙ্গসুধায়।

পড়া সেরে এলে তো সুবলই বা কে, আর রাজা-মহারাজাই বা কে!

সুবল দাহুর গায়ে গড়াগড়ি দিয়ে বলে, দাহু, একটা গল্প বল—

আদিনাথ বলেন, আমি কি আর গল্পটল্প জানি দাহু? চিরকাল আপিস করেছি, বাজার করেছি আর সংসার করেছি। গল্পের বই পড়িইনি।

বাঃ, তোমার দাহু তোমায় গল্প বলত না?

আমার দাহুকে আমি দেখিনি।

তোমার বাবা?

বাবাও আমার মতন চাকরি করেছেন, বাজার করেছেন।

আর তোমার মা?

তা মা দু-একটা গল্প বলতেন বটে। তা সে কি আর তোর ভাল লাগবে?

তুমি বলই না।

আদিনাথ খানিকটা অস্পষ্ট স্মৃতি আর খানিকটা আবোল-তাবোল জুড়ে গল্প বলেন।

এক দেশে এক সওদাগর বাস করত—

সওদাগর কী দাহু?

বাঃ, তা জানিস না ? ব্যবসাদার, এই যারা সব কেনা-বেচা করে।

ওঃ! তারপর ?

তা সেই সওদাগরের একটা খুব সুন্দরী মেয়ে ছিল। আর খুব চালাক মেয়ে। সে বলল, আমার জন্যে বর খুঁজছ বাবা, তবে বলে রাখি, আমাকে যে চালাকিতে হারিয়ে দিতে পারবে, আমি তাকেই বিয়ে করব।

সুবল হঠাৎ হেসে উঠে বলে, আমি হারিয়ে দিতে পারি।

তুই ? তুই তো বোকা বুদ্ধু।

ইস! তাই বৈকি। জানো না তো! হেসে ওঠে ছেলেটা।

আদিনাথ চমকে বলেন, কী জানি না ?

সুবল ততক্ষণে জিব কেটে, কান মুলে, আত্মস্থ সুরে বলে, আমার কত বুদ্ধি!

আদিনাথ আশ্বস্ত হয়ে বলেন, একজামিনের সময় বুঝব।

ও দাদু, তারপর কী হল ?

তা সেই মেয়েটা তো ওই সব বলেছে, আর দেশ-বিদেশ থেকে যত ছেলে আসছে চালাকির পরীক্ষা দেবার জন্যে, সওদাগর-কন্যা তাদের হারিয়ে দিচ্ছে।

কী করে হারিয়ে দিচ্ছে ?

বাঃ, পরীক্ষায় ফেলে! যেমন বলল, বলুন তো আকাশে কত তারা ? কেউ বলতে পারত না। সওদাগর কন্যে বলত, বলুন তো, মানুষ কাকে বেশী ভালবাসে ? কেউ বলত মা বাবাকে, কেউ বলত বৌকে, কেউ বলত ছেলেমেয়েকে, কেউ বা বলত বন্ধুকে। কন্যে বলত, হল না।

কন্যে আবার বলত, বলুন তো পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে ভাল খেতে কোন্ জিনিস ?

অনেকে অনেক কিছু বলত। কেউ বলত, ক্ষীর ছানা পায়েস মিষ্টি, কেউ বলত মাছ মাংস। কেউ বলত কোন ফলের নাম।

কন্যে বলত, হল না।

অনেকদিন পরে এক রাজপুত্তুর এল। সে বলল, আচ্ছা আমি যদি সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি তাহলে বিয়েটা হবে?

সওদাগর বললেন, হাঁ, নিশ্চয়।

তাহলে কিন্তু বিয়ের পর আমি যা খুশি করব!

সওদাগর বললেন, সে তো নিশ্চয়, সে তো নিশ্চয়। আমার একটা মাত্তর মেয়ে, তার বর হবে তুমি, তোমার যা খুশি করবে না?

একটা মাত্তর মেয়ে হলে খুব আদরের হয় দাতু?

তা হবে না?

তবে একটা মাত্তর ছেলে কেন তেমন হয় না?

আদিনাথ চমকে বলেন, কে বললে হয় না।

ছাই হয়। মা তবে রাতদিন বকে কেন?

আদিনাথ গম্ভীর হয়ে যান, ক্ষুব্ধ গলায় বলেন, তোমার মা একটু রাগী কিনা!

সুবল হঠাৎ মাতৃভক্তির প্রেরণা পায়। বিজ্ঞের মতো বলে, দোষও নেই দাতু, নানান জ্বালায়—

আদিনাথ সন্দেহের গলায় বলেন, তোর মার আবার এত কী নানান জ্বালা?

সুবল সামলে যায়।

বলে, এই রাখুর মা দুধ দিতে দেরি করে, বাতাসী বাসন মাজতে আসতে বেলা করে, উনুন ধরতে দেরি হয়—

আদিনাথ হেসে ফেলে বলেন, তা বটে! এত জ্বালা, মেজাজ তো খারাপ হতেই পারে।

মনে মনে হেসে ভাবেন, আহা, একেই বলে সরল শিশু।

আর সরল শিশু তখন ভাবে, উঃ, ভাগ্যিস! যাক, খুব ঠকিয়েছি বুড়োটিকে।

তারপর বলে, তারপর কি হল?

হল—হল—ও হ্যাঁ, রাজপুত্তুর বলল, তোমার মাথার যত চুল, আকাশে তত তারা।

কন্যে হেসে বলল, প্রমান কই ?

রাজপুত্তুর বলল, শুনে প্রমান করে দিচ্ছি। তোমার চুলগুলি কেটে দাও।

এই সেরেছে! সওদাগর-কন্যে ভাবলেন, আমার এমন রেশমের গোছার মতো চুল কেটে দেব? ও বাবা! তার থেকে 'আচ্ছা আমি হার মানছি' বলা ভাল।

তাই বলল।

কিন্তু দ্বিতীয়টা ?

রাজপুত্তুর বলল, মানুষ সব থেকে নিজেকে ভালবাসে।

প্রমাণ কি ?

প্রমাণ? প্রমাণ হচ্ছে যার যত প্রাণের লোক হোক, মরে গেলে কেউ মরে যায় না। ঠিক বেঁচে থাকে।

আচ্ছা কোন্ জিনিস সব থেকে খেতে ভাল ?

রাজপুত্তুর বললেন, নুন।

নুন!

ওমা! এ কী কথা? একটু বেশী খেলেই বমি হয়ে যায়।

রাজপুত্তুর বললেন, আচ্ছা প্রমাণ দিচ্ছি। সাতদিন রাজ্যের সমস্ত দোকানে যত সুখাদ্য আছে সব ঢেলে বিক্রি হোক, শুধু নুনের দোকান বন্ধ করে রেখে দিন, দেখুন কি হয়।

ওমা, দেখা গেল তিনদিন না যেতেই দেশসুদ্ধু লোক বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে, দোর খোল, নুন না খেয়ে মারা যাচ্ছি।

রাজপুত্তুর বলল, দেখলে তো? কেউ ক্ষীর ছানা না খেতে পেলে পাগল হয় না, কিন্তু নুন না পেলে! কী হয় দেখলেই তো!

তাহলে আর কী ?

বিয়ে।

খুব ঘটা করে বিয়ে হল। তখন রাজপুত্তুর বললেন, এইবার আমার যা খুশি করি? আমার খুশি হচ্ছে ওই বৌকে সাত ঘা চাবুক মারা!

সুবল বলে, অ্যাঁ ?

হুঁ তো। ও অত লোককে চালাকি করে কষ্ট দিল যে! পাপ হয়নি ?

সুবল একটু চুপ করে থেকে বলে, আচ্ছা দাদু, যদি চালাকি করে কারুর কষ্ট কমিয়ে দেওয়া হয়, তাহলেও পাপ হয় ?

আদিনাথ বলেন, তা জানি না।

কিন্তু আদিনাথের হঠাৎ হঠাৎ মনে হয়, ছেলেটা যেন তাঁর কাছে কী চাপে।

কী চাপে ?

এই বকুলতলায় বসে বসে আদিনাথ ভাবেন, ভগবান, হঠাৎ একবারের জন্যে এই চোখ দুটোর পর্দা খুলে দিতে পার না? আমি অন্ততঃ একবারের জন্যে দেখে নিই, কোথায় কী ঘটছে।

নাকি সব ঠিক আছে ?

হঠাৎ একদিন দেবনাথ বাবার কাছে এসে নিজেই ঘটা করে বলে, কিছুকালের মতো ডেলি-প্যাসেঞ্জারির দায় থেকে নিশ্চিন্দি, বুঝলে বাবা! নিশ্চিন্দি !

আদিনাথের দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহটা একবার কেঁপে উঠল। যেন এইটি শোনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন। তবু আদিনাথ আন্দাজি ছেলের দিকে মুখ তুলে একটু যেন বোকাটে গলায় বলে উঠলেন, নিশ্চিন্দি মানে ?

মানে আর কি !

বাবা দেখতে পাবেন না জানা সত্ত্বেও দেবনাথ হাতের চেটো দুটো উল্টে ক্ষুব্ধ কৌতুকের গলায় বলে, মানে স্ট্রাইক !

স্ট্রাইক ?

অনুভূতির দ্বারা কি ওর মুখের প্রকৃত চেহারাটা বুঝতে পারবেন আদিনাথ ?

আদিনাথ কী ধ্যানে বসবেন ? ধ্যানের মধ্যে অনুভবে পাবেন ওই কৌতুকের স্বরূপটা কি ? তবু কথা তো বলতেই হবে। তাই

বলেন, স্ট্রাইক? কতদিনের জন্যে?

সে আজকালকার যা ব্যাপার! বলতে গেলে অনির্দিষ্টকালের জন্যেই, মানে যতদিন না একটা ফয়সালা হচ্ছে—কথাটার পিছনে ড্যাশ টেনে দিয়েই দেবনাথ তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, তবে আমার কিছু অসুবিধে নেই, মানে আমার মতো দু'চারজন যারা ইউনিয়নে নেই, তাদের মাইনে আটকে রাখবে না।

আদিনাথের বুক থেকে একট ভারী নিশ্বাস নেমে যায়। আদিনাথ বলেন, তবু ভাল।

দেবনাথ মহোৎসাহে বলে, তা সত্যিই একপক্ষে ভাল।…মানে অনেক দিন থেকেই শরীরটা তেমন ইয়ে যাচ্ছে না, একটু রেস্ট হবে, তাছাড়া সুবলটার পড়াশুনোগুলো কিছুটা দেখা যাবে, ইয়ে বাড়িটাও কতদিন মেরামত করা হয়নি দেখা-টেখার অসুবিধেয়, ভাবছি এই ফাঁকে যদি—

অফিসের ওই স্ট্রাইকটা থেকে দেবনাথের আর কী কী সুবিধে হতে পারা সম্ভব তাই বোধহয় ভাবছিল দেবনাথ, আদিনাথ তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন, না না, এক্ষুনি বাড়িতে হাত দেবার দরকার নেই, তোমার শরীরটাই যাতে—বিহারীর কাছে একবার গেলে ভালো হত।

মাধুরী এসে দাঁড়াল, বাবা আপনার চা—

চা মানেই মুড়ি, হালুয়া, ফুলুরি।

আদিনাথ অভ্যস্ত ভঙ্গীতে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলেন, দেবু কি তাহলে আজ থেকেই অফিস যাচ্ছ না?

দেবু যে কতদিন থেকে যাচ্ছে না, সে কথা দেবু আর দেবুর বৌ ভালই জানে, তবু দেবু অনায়াস গলায় বলে, হ্যাঁ, ও কালই সব কথাবার্তা হয়ে গেছে, মাস পড়লে চুপিচুপি কর্তাদের কাছ থেকে মাইনেটা নিয়ে আসতে হবে—

দেবনাথের কি পাপ হচ্ছে না?

বাপের সামনে এমন ডাহা মিথ্যে কথাগুলো বলতে? কিন্তু দেবুর মুখ দেখে ঠিক তা মনে হয় না, দেবু যেন একটা ছেঁড়া কাপড়

রিপু করে সামলে নিচ্ছে।

মাধুরীর মুখটা কেমন দেখাচ্ছে তা দেখছে না দেবনাথ, বাবার ওই ব্যাকুল-উৎসুক মুখটার দিকেই দেখে। আদিনাথের মুখের সমস্ত রেখাগুলো যেন চোখের মণি হয়ে জ্বলে উঠতে চাইছে।

দেবনাথ ভাবছে মাঝে মাঝে তো যেতেই হবে কলকাতায়, ওই মাইনে আনা সময়ের আন্দাজেই যাব। বাবার যাতে সন্দেহ না হয়।

আদিনাথের মুখের রেখায় হঠাৎ পরিবর্তন আসে, আদিনাথ মহোৎসাহে বলে ওঠেন, তাহলে দেবুকেও আর এক প্রস্থ চা দাও বৌমা, আর একটু হালুয়া কি মুড়ি। মুড়িটা খাওয়া ভাল, শরীরের পক্ষে উপকারী।

দেবনাথ বৌকে ইশারায় নিবৃত্ত করে মুখে বলে, আচ্ছা ওই মুড়িই দাও ছুটি, বেশী নয়।

আদিনাথ ভরাটি গলায় বলেন, খাওনা চারটি, আজ তো আর ট্রেন ধরতে যেতে হচ্ছে না। আমার সঙ্গে একসঙ্গেই ভাত খেতে পারবে। বৌমা, রান্নাটা আজ একটু ইয়ে করে করো। রোজই তো সেই তাড়াতাড়ি খেয়ে যায়।…ইয়ে—কচুর শাক হয়নি বৌমা পুকুরধারে? এ সময় তো হবার কথা। তাই চারটি তুলে এনে রাঁধো দিকি আজ বেশ নারকেল কুরো মটর ভিজে টিজে দিয়ে। ওটা তোমার হাতে খুব খোলে। আর বরং পোস্তচচ্চড়ি।…মাছটা কী আনবে দেবু?

দেবু কষ্টে নিশ্বাস চেপে বলে, দেখি কী পাই। সব দিন তো—

সেই তো, এ তোমাদের কলকাতা নয় যে যা চাইবে তাই পাবে। তবে আমি যখন ডেলি-প্যাসেঞ্জারী করেছি, বরাবর ফেরার পথে কলকাতা থেকে বাজার করেএনেছি। কপি, কড়াইশুঁটি, বালির পটল, বড় বড় বাগদাচিংড়ি, গোটা ইলিশ, মনে নেই তোর?

দেবনাথ বেশ গল্পের আমেজ মিশিয়ে বলে, তা আর মনে নেই! মা বলত, আমার তো শুধু কষ্ট করে রাঁধাই সার, খেলেই অসুখে মরবো।

সেই তো, তাই বলছিলাম সেদিন বৌমাকে, ছেলে ঠিক মার ধাতটি

পেয়েছে। টাটকা মৌরলা পাস তো আনিস দিকি দেবু, মৌরলার সর্ষের ঝালটা ভাল হয়।

মাধুরী বিড়বিড় করে বলে, জগতে আর কোন কথা নেই, শুধু খাওয়ার কথা!

আদিনাথ হঠাৎ একটু সতর্ক গলায় বলেন, কই, তুই খাচ্ছিস না?

দেবুর অম্লান গলা, এই তো খেলাম।

মুড়িটা বেশ মুচমুচে, না? সত্ন মুড়িটা ভাজে ভাল।

খাওয়ার পর্ব সেরে আদিনাথ বলেন, কই হে, কোথায় গেল আমার অন্ধের যষ্টি?

সুবল জানে এ তার বিশেষণ, সে কোথা থেকে যেন সাড়া দেয়, যাচ্ছি।

চল, তোমার ডিউটিটা পালন কর। তবে এখন কিছুদিন মাঝে মাঝে ছুটি পাবে, বাবার অফিস ছুটি।

এটা কি হল!

সুবল সবিস্ময়ে একবার মা-বাপের মুখের দিকে তাকায়, ফাঁস করল কে?

ইশারায় কিছু কথা হল, সুবল হাততালি দিয়ে বলে উঠল, কী মজা, কী মজা, বাবার ছুটি—

সেইদিনই গ্রামময় রাষ্ট্র হয়ে গেল দেবনাথের অফিসে স্ট্রাইক চলছে, দেবনাথ মনের আনন্দে মাইনে নেবে আর বিশ্রামে থাকবে।

সে কি? এমন হয় নাকি?

হবে না কেন? দেবনাথ তো আর ইউনিয়নে যোগ দেয়নি? দেবনাথ সৎ ও সরল। দেবনাথকে ওপরওলারা কত সুনজরে দেখে।

গ্রামের অনেক জায়গায় ঘুরে অবশেষে বিহারীর চেম্বারে।

বিহারী ডাক্তার উৎফুল্ল গলায় বলে, চোখের সামনে একটা ফিকে নীল আলো দেখতে পাচ্ছেন? চাটুয্যে মশাই, আপনাকে আর কি বলব,

আমার গুরুকেই প্রণাম জানাচ্ছি। তবে আপনি দাদা লাকীম্যান। এই বয়সে চলে যাওয়া চোখ ফিরে পাওয়া চাট্টিখানি কথা নাকি ?

আদিনাথও উৎফুল্ল মুখে বলেন, তাহলে বলছ ফিরে পাওয়ার আশা আছে ?

আশা আছে মানে ? পাচ্ছেন তো, পেলেন বলে, বড়জোর আর ছ'সাতটা মাস।

ছ'সাত মাস, সেও তো অনেক দেরি বেহারী, ততদিন বাঁচব তো ?

বিহারী ডাক্তার হা হা করে হেসে ওঠে, রীতিমত জোর হাসি, বলছেন কি চাটুয্যে মশাই, ছটা-সাতটা মাস বাঁচবেন না ? আপনি এখনো দশটি বছর বাঁচবেন, বুঝলেন ? টেন্ ইয়ার্স ! এই বয়সে কি হেলথ ! নাঃ, আপনাকে এখুনি কেউ নিয়ে যেতে পারবে না।

আদিনাথ পুলকের গলায় বলেন, চোখটা ফিরে পেলে আর বাঁচতে ভয় পাই না, বুঝলে ডাক্তার ?

ফিরে পেতে তো শুরুই করেছেন, বিহারী বলে, ওই যে নীলচে আলোটি, ওইটি খুব শুভ লক্ষণ। কই এর আগে কি ওটা দেখেছেন কোন দিন ?

কই মনে তো পড়ছে না, আদিনাথ বলেন, এটা নতুনই মনে হচ্ছে। আগে সেই বেগুনী হলদে এই ধরনের ফুটকি ফুটকি দেখছিলাম।

সেই তো, ওইগুলো ফার্স্ট স্টেজ। বিহারী আশাভরা গলায় বলে, আপনি সেরে উঠে আমায় জাতে তুলে দেবেন চাটুয্যে মশাই। এখনো আমাদের দেশে হোমিওপ্যাথির প্রতি তেমন আস্থা নেই লোকের, কিন্তু এইরকম এক-আধটি কেস দেখালে—কী অভূতপূর্ব ব্যাপার হবে, সেটা আর ভাষায় ব্যক্ত করে না বিহারী ডাক্তার, হাত এবং চোখ ও মুখের সাহায্যে অধিকতর প্রাঞ্জল করে দেয়। তারপর বিহারী আদিনাথের ছেলের কথা পাড়ে, ছেলে তাহলে এখন কিছুদিন বাড়িতেই থাকবেন ?

তাই তো বলেছে। আমিও শুনে বলছিলাম, এই অবকাশে একবার বেহারীর কাছে চলে যা, ওকে দেখা, বেহারীর ওষুধ ডেকে কথা কয়।

বিহারী ডাক্তার একটু চমকে বলে, কেন, ছেলের কি হয়েছে ?

আদিনাথ একটু নড়েচড়ে বসেন, বলেন, কিছু না ভায়া, কিছু না, স্রেফ বাতিকের ব্যাপার। বারো মাসই খিদে নেই, আর পেটে সহ্য হয় না। ভয়ে ভয়েই পেট মরে যাচ্ছে। এই বয়সেই যদি এই হাল হয়, তাহলে আমার মতন বয়সে কি অবস্থা হবে, তুমিই বল ? না না, এ বাতিক বাড়তে দেওয়া ঠিক নয়, তুমি ওকে একটা হজমের ওষুধ বাৎলাও।

কিন্তু দেবনাথ যে বাবার প্রস্তাব হেসেই উড়িয়ে দেয়। বলে, মাথা খারাপ। অসুখ-বিসুখ নেই, ডাক্তার দেখাতে ছুটব ? এবার দেখবে দিব্যি খাবো-দাবো। ঘুম থেকে উঠেই ভাত, ও কি আর খাওয়া যায় ?

আদিনাথ উদ্দীপ্ত গলায় বলেন, কি বলিস খোকা ? আমি করিনি সেই কুড়ি বছর বয়েস থেকে ডেলি-প্যাসেঞ্জারী ? তখন সংসারের অবস্থাই বা কি ? আদিনাথ যেন রূপকথার গল্প শোনাচ্ছেন এমনই সুরে বলেন, তখন তোর ঠাকুমা বেঁচে, পিসিদের বিয়ে হয়নি, আয় বলতে আমার ওই সামান্য মাইনে, কি ভাবেই যে চালিয়েছেন মা ! বললে বিশ্বাস করবি না, মাসে একদিন মাত্র মাছ খেতাম আমরা। মার যেদিন একাদশী থাকত, সামান্য দুটো চুনোপুঁটি মাছ এনে ঝোল আর ভাত করে দিয়ে তবে চান করতে যেতেন মা। খুব বিচার-আচার ছিল তো ? কিন্তু ভেবে দ্যাখ, মাসের মধ্যে উনত্রিশটা দিন কচু কুমড়ো পুঁই লাউ, ওই সব চলছে। ওইগুলো তো পয়সা দিয়ে কিনতে হত না। উঠোনেই হত।

দেবনাথের মুখ দেখতে পান না আদিনাথ, ওইখানেই মজা। দেবনাথরাও যে আজ কতদিন ধরে ওই পয়সা-দিয়ে-না-কেনা তরকারি দিয়েই চালাচ্ছে, মাধুরীও যে নেহাৎ একাদশীর দিন নিরামিষ খাবে না বলে কেঁদেকেটে দুটো পুঁটিমাছ রেঁধে এয়োতি রক্ষা করছে, এ কথা টের পাবার উপায় নেই আদিনাথের।

কিন্তু দেবনাথেরই বা এমন নেশায় পেল কেন? দেবনাথ অনায়াসে বলেছে কি করে, উঃ ভাবাই যায় না!

হুঁ, তোমরা ভাবতেই পারবে না। গেঞ্জি কিনতে পারি না, শতছিদ্র গেঞ্জি পরে, তার ওপর কোট চাপিয়ে আফিস যাচ্ছি, গরম হলে কোট খুলে রাখতে পারি না, এই অবস্থা।

বাবা দেখতে পান না, তবু দেবনাথ হঠাৎ কোঁচার খুঁটটা তুলে গেঞ্জিটার ওপর জড়ায়।

লুকোচুরির এই রহস্য যেন এ বাড়িতে একটা নাটক লিখে চলেছে।

সুবল হাঁক পেড়ে বলে, দাতু, আজ বাবা যে সন্দেশ এনেছিল, খুব ভালো ছিল, না?

মাধুরী আর সকালে জনতা জ্বেলে শ্বশুরের জলখাবার করতে যায় না, বলে, শরীর ভাল নেই, কিছু কিনে এনে দাও।

নিজের স্বামী-পুত্তুরকে বাদ দিয়ে শুধু এক লোলুপ বৃদ্ধের পাতে সব ধরে দিতে বুক ফেটে যায় মাধুরীর, রাগে হাড় জ্বলে যায়। বলে, পারব না, পারব না, আমায় তোমরা ছুটি দাও।

অতএব বাধ্য হয়েই দেবনাথ দোকান থেকে নিমকি, সিঙাড়া, তেলেভাজা, সন্দেশ এনে দেয় বাবার যুগ্যি যুগ্যি। পেনশনের যে টাকাটা বাবা তাকে মাসান্তে এনে ধরে দেন, সেই টাকা থেকে হিসেব করে করে।

সুবলের দিকে তাকাতে পারে না দেবনাথ। তবু সুবল মহোৎসাহে বলে, সন্দেশটা খুব ভাল ছিল, না দাতু?

আদিনাথও মহোৎসাহে বলেন, খেয়েছিস? দিয়েছে তোর মা?

কেন দেবে না? মা তো আমায় তুটো দিল।

তবু ভাল। তোর মা তো অসুখ করবে, অসুখ করবে বলে কিছু দিতে চায় না তোকে। হ্যাঁ রে, বাবা খেয়েছিল?

সুবল অম্লান বদনে বলে, হ্যাঁ।

মা বোধ হয় খায়নি, কি বলিস?

এবার সুবলকে ঢোক গিলতে হয়, তা জানি না।

কি জানি খায় কি না খায়। এই যে সংসারে এত জিনিস হচ্ছে, তোর মা কিছু খাচ্ছে বলে টের পাই না। তোর দিদাও ওই করত, সব কিছু আমায় ধরে দিত—

সুবলের সঙ্গে তার দিদার কথা চলে কিছুক্ষণ। কিন্তু ঘুরেফিরে তো সেই খাওয়ার কথাই।

আদিনাথ যখন কিছুদিন কুস্তির আখড়ায় গিয়ে কুস্তি শিখতেন, সুবলের দিদা আদিনাথকে কেমন কাঁচা দুধের সঙ্গে বাদাম বেটে গুলে সরবৎ করে দিত। আদিনাথ যখন ডাম্বল ভাঁজতেন, সুবলের দিদা কেমন রোজ রোজ মাংসের ঝোল কিংবা মেটের ঝাল রেঁধে দিত, আর আদিনাথ যখন ডলে ডলে তেল মাখতেন, দিদা কেমন কৌশলে নিজে ডলে দিয়ে আধপোয়া তেল আদিনাথের লোমকূপের ছিদ্রে ছিদ্রে শরীরে চালান করে দিত। এসব গল্প আর কেই শুনবে সুবল ছাড়া?

আদিনাথ কারুর মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ালেই তো তারা ভাবে এই সেরেছে!

আদিনাথ কি বুঝতে পারেন না?

আদিনাথের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়টা তো হারিয়ে যায়নি।

কি জানি! মনে তো হয় না বুঝতে পারেন।

মাঝে মাঝে বদন দাসের দোকানেও এসে বসেন আদিনাথ। আজও এলেন। সুবল বলল, দাদু, তুমি বসে থাক। আমি একটু পরে এসে তোমায় নিয়ে যাব। আজ তো রবিবার। ছুটি।

আদিনাথ সাবধানে বদনের দোকানের বেঞ্চে গুছিয়ে বসেন, সহাস্যে বলেন, দেখেছ বদন আমার গার্জেনটিকে? কী দায়িত্ববোধ! ছেলেমানুষ, কখনও খেলায় উন্মত্ত হয়ে ভুলে যায় না।

বদন দাস ঠেলা-মারা গলায় বলে, হ্যাঁ, নাতিটি আপনার ভাল, তা ওর মা আপনাকে খুব যত্নটত্ন করে, কী বলেন খুড়োমশাই?

আদিনাথ বড় গলায় বলেন, তা আর বলতে।

বদন দাস অন্য খদ্দেরদের সঙ্গে কথা বলে। আবার দোকান খালি হলে এক কাপ চা এগিয়ে দিয়ে বলে, খুড়োমশাই, চা খান।

এই দেখ আবার তুমি এখন চা দিচ্ছ? তা দেবে দাও। সত্যি বলতে তোমার এই চা-টার গন্ধে গন্ধে একটু ইচ্ছেই করছিল। তা পয়সাটা তো এখন—মানে আর কি, নিয়ে তো বেরোইনি।

তাতে কি, তাতে কি, আপনাকে এক কাপ চা খাইয়ে বদনের দোকান ফেল হয়ে যাবে না খুড়োমশাই, ও ধার আপনাকে শুধতে হবে না।

না না, ওটা ঠিক নয় বদন, ওটা ভাল ব্যবসাদারের লক্ষণ নয়। পরে পাঠিয়ে দেব। চায়ে চুমুক দিতে দিতে উপদেশ দেন আদিনাথ।

বদন দাস এবার অন্তরঙ্গ সুর ধরে, বেহারী ডাক্তার নাকি আপনাকে চোখের দিষ্টি ফিরিয়ে দেবে বলে ভাঁওতা দিয়ে মুচড়ে মুচড়ে পয়সা নিচ্ছে?

আদিনাথের হাতের চা চলকে যায়, আদিনাথ প্রায় দাঁড়িয়ে উঠে বলেন, তার মানে? কে বলেছে এ কথা? শুনি তার নামটা?

বদন একটু থতমত খেয়ে বলে, না মানে, ওর ডাক্তারখানায় যারা যায় আসে তাদেরই কে যেন বলছিল, রোজ নাকি আপনি ওষুধ নিতে যান।

আদিনাথ আবার বসে পড়ে বলেন, ওঃ, শোনা কথা? বাজে লোকের কথা। ওষুধ আবার কি! ওখানে গিয়ে একটু বসি, পাঁচটা লোক আসে-টাসে, কথা বলে, ভাল লাগে। লোকের স্বভাব দেখেছ বদন? কেবল পরের কুচ্ছা গাইবে।

বদন দাসও নিজেকে সামলে নেয়, বলে, তাই দেখছি। আপনি যান বেড়াতে, আর লোকে বলে বেড়াচ্ছে, যান ওষুধ নিতে। আমিও তাই বললাম, খুড়োমশাই কি এতই বোকা যে বেহারী ডাক্তার তাঁকে ঠকিয়ে খাবে?

চায়ের পেয়ালাটা আন্দাজে নামিয়ে রেখে লাঠি ঠুকে উঠে দাঁড়ান আদিনাথ, বলেন, চলি বদন।

সে কি, আপনার গার্জেন তো আসেনি এখনও ?

না আসুক, এটুকু আমি আন্দাজে আন্দাজে চলে যাব। চিরকালের চলা পথ তো হে !

তবু বদন বলে, না না খুড়ো মশাই, তা হোক, চিরকালের মতো তো চিরকাল চলে না ? আপনি পথে হোঁচট খেলে আপনার নাতি এসে আমায় দুষবে।

ওঃ, নাতি ! ভারি আমার লায়েক নাতি রে ! তার সাধ্যি হবে তোমায় দুষবে ! ঠকঠক করে এগিয়ে যান আদিনাথ।

বদন ইশারায় তার দোকানের ছেলেটাকে সঙ্গে যেতে বলে, মুচকে হেসে ভাবে, বুড়োর রাগ হয়েছে। ঠকিয়ে খাওয়ার কথা বলেছি কিনা। খাচ্ছে না তো কি ? সত্যি তোর চোখে ফের পিদিম জ্বেলে দেবে বেহারী ডাক্তার ?

বেহারীর ডাক্তারখানায় তখন লোকের সমাগম কমে গেছে। বেহারী মনে মনে ভাবছিল, আজ বুড়োর হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেল বোধ হয়। বদনের দোকানে গিয়ে বসেছে, জমে গেছে, হঠাৎ আবার একা লাঠি ঠুকতে ঠুকতে আসতে দেখে হতাশ ভঙ্গীতে কপালে হাত ঠেকায়।

ঠেকায় আদিনাথের সামনেই।

নির্ভয়েই ঠেকায়।

তারপর পালিশ গলায় বলে, আসুন আসুন চাটুয্যে মশাই, আমি ভাবলাম আজ বুঝি আর এলেন না। বদনের দোকানেই জমে গেলেন।

আদিনাথ ওঁর নির্দিষ্ট চেয়ারটায় বসে পড়ে বলেন, ডাক্তার,তোমার সঙ্গে আমার কি কথা ছিল ?

উত্তেজিত অবস্থায় একা চলে আসায় আদিনাথের সর্বশরীর কাঁপছিল, গলাও থরথরিয়ে কেঁপে উঠল।

বেহারী প্রমাদ গনল।

বুড়ো আবার ক্ষেপল কিসে ?

বেহারী শান্ত গলায় বলল, ব্যাপারটা কি চাটুয্যে মশাই ?

দোকানে কেউ আছে ?

না তো।

বলছি—কথা হয়েছিল কিনা তোমার এই চিকিচ্ছের কথা কাকে-পক্ষীতে টের পাবে না। শুধু তুমি জানবে আর আমি জানব।

হ্যাঁ, তাই তো! বেহারী ডাক্তার আরও শান্ত গলায় বলে, সেই রকমই চলছে।

চলছে ? আদিনাথ আরও উত্তেজিত গলায় বলেন, অথচ বদন দাস বলে বসল, বেহারী ডাক্তার নাকি আপনাকে চোখ ভাল করে দেবার ভাঁওতা দেখিয়ে ওষুধ দিচ্ছে। উত্তেজিত হলেও পয়সার কথাটা সামলে নেন আদিনাথ।

বেহারী অতাত। বেহারী নিরুদ্বিগ্ন। বেহারী নির্লিপ্ত গলায় বলে, এই কথা ? আর কিছু বলেনি বদন ? বলেনি বেহারী ডাক্তার আপনাকে ভোগা দিয়ে কুরে কুরে পয়সা নিচ্ছে ? বলেছে বোধ হয় ?

আদিনাথ অপ্রতিভ হয়ে বলেন, না না, ওকথা বলেনি, ওকথা বলেনি। ওই ওষুধের কথাই বলছিল। তবে ওটা তো প্রকাশ করার কথা ছিল না ?

ওসব মনগড়া অনুমানের কথা চাটুয্যে মশাই! এই যে আপনি আমায় একটু ভালবাসেন, এসে বসেন-টসেন, লোকের চোখ টাটায়। কেউ যেমন কারুর ভাল দেখতে পারে না, তেমনি কারুর সঙ্গে কারুর একটু ভালোবাসাও দেখতে পারে না। অমনি কান ভাঙাতে বসবে, মন ভাঙাতে বসবে। নিজের ইষ্ট থাক না থাক, পরের অনিষ্ট তো হল।

লোকচরিত্র সম্পর্কে বেহারীর এই জ্ঞানগর্ভ কথা শুনে আদিনাথ একটু শান্ত হন, বলেন, তাহলে বলছ তুমি কাউকে বলোনি ?

পাগল হয়েছেন ? বেহারী জিভ কাটে। যদিও সেটা মাঠেই মারা যায়।

আদিনাথ বলেন, তবে বদন কথাটা নেহাত মিথ্যে বলেনি বেহারী, আশাটা বৃথা আশা। ওই তো কাল একটু নীলচে আভা দেখেছিলাম, আজ যে অন্ধকার সেই অন্ধকার।

বেহারী বলে, আমি তো আপনাকে বলেইছি দাদা, হোমিওপ্যাথির নিয়মই হচ্ছে ধীরে ধীরে রোগ সারায়। তবে সারায় একেবারে মূল শেকড় থেকে। অ্যালোপ্যাথির মতো রোগ চাপা দিয়ে আপাততঃ নাম কেনে না। আপনি ব্যস্ত না হয়ে নিশ্চিন্ত মনে থাকুন, দেখবেন (একাশী বছর তো কমপ্লীট করেছ বুড়ো, আর কতদিন?) আমার গুরুর মহিমা দেখাতে পারি কিনা। বই পড়বেন, বুঝলেন, আবার নিজের চোখে বই কাগজ পড়বেন।

আদিনাথ আন্দাজে হাত বাড়িয়ে বেহারীর গা-টা প্রায় খামচে ধরেন, বলছ ডাক্তার? ফের কাগজ পড়তে পারব? তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক ভাই। ওই কাগজটা পড়তে না পারা পর্যন্ত জীবনটা যেন অন্ধকার হয়ে গেছে। অন্ধ বুড়োকে কে আর বসে বসে পড়ে শোনাবে বল? নাতিটাকে বলি, একটু চেষ্টা করে দেখ্। তবে কি জান, অর্থ গ্রহণ না করে পড়া তো? তাও খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। এই তো সাত বছর মাত্তর বয়েস। ওতে রস পাই না। বলি থাক দাদু, আর কষ্ট করতে হবে না।

বেহারী উদার গলায় বলে, কী বলব চাটুয্যে মশাই, আমার যে মরবার সময় নেই, নচেৎ আপনাকে এ কষ্ট পেতে হয়?

এই দেখ বেহারী, তুমি যে ভালবেসে বললে কথাটা, তাতেই প্রাণটা ভরে গেল। তুমি কখন সময় পাবে ভাই, দেখছি না আমি তোমার অবস্থা?

সারাদিন বেহারী কেন মরবার সময় পায় না, সে প্রশ্ন ওঠে না আদিনাথের মনে, আদিনাথ ভরাট মনটা নিয়ে উঠলেন।

একি একা যাচ্ছেন?

আদিনাথ হাসি হাসি মুখে বলেন, এলাম তো বদনের দোকান থেকে। হয়তো ভেতরে ভেতরে হচ্ছেই কিছু উপকার।

ঠাকুর জানেন।

ভক্তিমান ডাক্তার হাত জোড় করে। তারপর হেসে ফেলে বলে, পরীক্ষা হল না চাটুয্যে মশাই, ওই যে আপনার বডিগার্ড আসছে পাঁই পাঁই করে।

সঙ্গে সঙ্গেই সুবলের তীক্ষ্ণ গলা বেজে ওঠে, দাছু, তুমি একা একা চলে এলে যে বড় ?

এলাম তো কী ? আদিনাথ তেজের সঙ্গে আরও বলেন, হুমড়ে পড়ে হাত-পা ভেঙেছি ?

ভাঙেনি, ভাঙতে পারত তো ! সুবল এগিয়ে এসে দাছুর হাতটা বাগিয়ে ধরে বলে, তা হলে তোমার ছেলে আমায় কী বলত ?

আদিনাথ হা হা করে হেসে ওঠেন। চেঁচিয়ে বলেন, শুনলে বেহারী, ছোঁড়ার কথা ! বাবাকে খুব ভয় করিস, না ? ভাল ভাল, তোর বাবাও ছেলেবেলায় আমায় খুব ভয় করত।

মনটা প্রসন্ন করে বাড়ি ফেরেন আদিনাথ। বাইরে থেকে হাঁক পাড়েন, দেবু বাড়িতে আছিস নাকি ? না বেরিয়েছিস ?

দেবু রান্নাঘরের মধ্যে বসে ছুখানা রুটি সহযোগে চা খাচ্ছিল। চা-টা ছুধছাড়া রুটিটা শুকনো, তবু তার থেকেই অর্ধাংশ নিয়ে জবরদস্তি করে মাধুরীকে খাওয়াচ্ছিল। বাবার হাঁকে মুখটা একটু বিরস করল, সাড়া দিল না। সাড়া দিলেই তো বকবকানি শুরু হয়ে যাবে। ছু-দণ্ড মাধুরীর সঙ্গে কথা বলার উপায় নেই।

তা সাড়া না দিলেও উপায় রইল না, উনি বৌমাকে ধরলেন।

বৌমা, এত রোদ্দুরে কোথায় আবার বেরোলো দেবু ?

বৌমা, চাটুকু ঢক্ করে গিলে নিয়ে গলা তুলে বলে, আপনিও তো এতটা বেলা অবধি রোদে ঘুরে এলেন বাবা ?

আহা, আমি তো এলাম ! ও যে এখনও বাইরে। গেছে কোথায় ?

কি জানি !

এই তো বুদ্ধির দোষ! মানুষটা কোথায় যাচ্ছে সেটা জেনে নেবে তো?

মাধুরী ফেটে-পড়া অবস্থাটাকে সামলে ফট করে বলে বসে, তা ওর জন্যে আবার এত চিন্তা কি? ও তো আর চোখে দেখে না এমন নয়? দেবুর বাধা দেওয়া সত্ত্বেও কথাটা বলা হয়ে যায়।

আদিনাথ চৌকিটার ওপর বসে পড়েন। আস্তে বলেন, তা বটে। আমারই পাগলামি। আসল কথা কি জান বৌমা, নিজের মধ্যে ভয় তো? তাই মনে হয়, রাজ্যটাই বুঝি ভয়-ভাবনার জায়গা।

দেবু নিঃশ্বাস ফেলে রান্নাঘরের পিছনের দরজা দিয়ে বাগানে নেমে যায়। একটু পরে সামনে দিয়ে ঢুকতে হবে। আর বেশ কিছুটা সোরগোল করেই ঢুকতে হবে।

কিন্তু মাধুরীকেই বা দোষ দেওয়া যায় কী করে? ওর জীবনও তো জরজর হয়ে উঠেছে ক্রমশঃ! যে দেবনাথের ছুটিছাটা কত প্রার্থনার বস্তু ছিল, ছুটির দিন পরিপাটি করে খাওয়ানোর আনন্দ ছিল, বাবাকে আড়াল করে হাসি-ঠাট্টা খুনসুড়ি ছিল, সেই দেবনাথ মাসের পর মাস ছুটি করে বাড়িতে বসে আছে, মাধুরী তার পাতে বলতে গেলে শুধু ডাল ভাত ধরে দিচ্ছে। শাকপাতা দেবনাথ কোনদিনই তেমন খেতে পারে না। তাছাড়া সেসব বস্তুকে তেল মশলা দিয়ে তরিবৎ করে রাঁধলে তবে তো খাদ্যযোগ্য? সেটা হয়ে উঠছে কই?

অথচ আদিনাথের জন্যে সবটি চাই। এই বিড়ম্বনা আর সহ্য হচ্ছে না তার।

মাধুরী রেগে রেগে দেবনাথকে বলে, চাকরি মানুষের যায় না? সেটা খুলে বলতে দোষটা কী ছিল? তাহলে তো ঘরে-বাইরে এত যন্ত্রণা পোয়াতে হত না। মিথ্যে কথার চাষ করতে করতে জীবনে ঘেন্না ধরে গেল। এতদিনের ঝিটাকে মিছিমিছি দোষ দিয়ে মন্দ কথা বলে ছাড়াতে হল। একটা বন্ধু ছিল, আসত

যেত, সুখদুঃখের কথা কইতাম, সেটার সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে আসা বন্ধ করলাম। আমি একটা মানুষ তো? না কি?

হ্যাঁ, এইগুলোই করতে হয়েছে মাধুরীকে। ঝি তুলে দেবার জন্যে ছুতো করে তার দোষ বার করে ভাগাতে হয়েছে, আর রত্নার সঙ্গে গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধাতে হয়েছে।

রত্না বলেছিল, দেবুবাবুকে প্রায়ই বাড়িতে দেখছি কেন রে? শরীরটরীর খারাপ হয়েছে বুঝি?

মাধুরী বলে উঠেছিল, শরীর খারাপ শত্রুর হোক।

এ আবার কী কথার ছিরি—হেসেই বলেছিল রত্না, মেজাজে এত আগুন কেন? বুড়ো বুঝি খুব জ্বালাচ্ছে? তবু ভাই বলি, ওটি অন্ধ নাচার হওয়ায় তোর জ্বালা অনেক কম।

মাধুরী বলেছিল, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তোমায় যেন জন্ম জন্ম অন্ধ নাচার নিয়ে ঘর করতে হয়।

রত্না একটু থমকে দাঁড়িয়ে 'ওঃ' বলে চলে গিয়েছিল। তদবধি আর আসেনি।

হয়তো আশা করেছিল মাধুরীই আগে যাবে, মান ভাঙাবে, সেদিন কি কারণে মেজাজ অত খারাপ ছিল তা ব্যক্ত করবে, তার কিছুই হল না।

অতএব বিচ্ছেদই ঘটে গেল।

ব্যবধান বাড়তে লাগল।

কিন্তু এ ছাড়া উপায় কি ছিল? রত্নার আসা-যাওয়া থাকলেই তো সব ধরা পড়ে যেত। রত্নার অভিজ্ঞ চক্ষু এক নজরেই ধরে ফেলত না কি মাধুরীর সংসারে কী দৈন্য বাসা বেঁধেছে?

তা এসব তো মাধুরীই নিজে থেকে করেছে। দেবনাথ তো এসব পরামর্শ দিতে যায়নি। তখন মাধুরীই ভেবেছে—যে করেই হোক পৃথিবীর চোখ থেকে নিজের এই দৈন্যকে ঢেকে রাখি।

এখন মাধুরী যেন ভেঙে পড়ছে।

এখন মাধুরী বলছে, মানুষের কি চাকরি যায় না, অভাব অসুবিধে

হয় না ? এত লুকোচুরির কী আছে ?

দেবনাথ মনমরা গলায় বলে, আর কিছু না, বাবার জন্যেই। একেই তো চোখটা হারিয়ে পৃথিবী অন্ধকার হয়ে গেছে, তার ওপর আবার এই দুঃখের বোঝা—

তবে এই চলুক।

মাধুরী তেতো গলায় বলে, তোমাকে সুবলকে ফ্যান-ভাত খাইয়ে আমি ওনার ষোড়শোপচার জুগিয়ে যাই। জানি তুমি এক্ষুণি শোনাবে উনি নিজের পয়সার খাচ্ছেন, কিন্তু অসময়ে মানুষ ভাগ করেই খায়।

দেবনাথ অন্যমনা গলায় বলে, জানি মাধু। তবে কি জান, চিরকাল বাবার ওই শরীর স্বাস্থ্য বাতিক, তাই খাওয়া দাওয়ার ওপর অত ঝোঁক। রেখেছেনও তো স্বাস্থ্যটি ! কিন্তু একবার যদি টের পান আমার চাকরি নেই, আমাদের দিন চলা ভার হয়েছে, আর ওঁর দৃষ্টিহীনতার সুযোগ নিয়ে আমরা ওঁর সঙ্গে থিয়েটার করে চলেছি, তাহলে মনের ধিক্কারে আর কি খাবেন-দাবেন ? তাছাড়া এরপর আর মুখই বা দেখাব কি করে বাবার কাছে ? ভাবিনি তো এতদিন এভাবে টানতে হবে ? ভেবেছিলাম যা হোক কিছু একটা জুটিয়ে নিতে পারব।

সুবলের যেন ক্রমশঃ আসা কমে যাচ্ছে। সুবল আর তত উৎসাহে দাদুর গার্জেনগিরি করতে ছুটে এগিয়ে আসে না।

আদিনাথ যখন ডাক দেন 'কই হে আমার অন্ধের যষ্টি', সুবল মন্থর গলায় সাড়া দেয় 'যাচ্ছি' !

সুবল তখন রান্নাঘরে মার পিছু পিছু ঘোরে। দাদুর দরুন কিছু আছে কিনা সেই আশায়।

প্রথম প্রথম রাখতও মাধুরী দুখানা বেগুনি ফুলুরি, এক চামচ হালুয়া, এতটুকু মটর-ঘুগনি, একটুকরো মাছ-ভাজা, কিন্তু ইদানীং যেন মাধুরীকে একটা আক্রোশে পেয়েছে। মাধুরী নিঃশেষ করে

ধরে দেয় আদিনাথের সামনে।

সুবল রান্নাঘরে গিয়ে গুন গুন করে বলে, একটা ডুটো রাখতে হয় না বুঝি? বাঃ!

মা বলে, চুপ করে থাক্, রাগ বাড়াসনি।

শুধু মুড়ি বুঝি রোজ রোজ ভাল লাগে?

এরপর আর ওই মুড়িও জুটবে না, বুঝলি?

অভাবে স্বভাব নষ্ট কথাটা সত্যি বৈকি। যে মাধুরী ওই একটা মাত্র ছেলে বলে স্নেহে-মমতায় বিগলিত হত, সেই মাধুরী এহেন নিষ্ঠুর কথা বলে বসে যখন-তখন।

কিন্তু যাকে কানের সোনাটুকু পর্যন্ত খুলে দিয়ে ভাত-মুড়ির যোগান দিতে হচ্ছে, তার কাছে আর সরসতা আশা করা যায় কি করে?

তবু দেবনাথ আদিনাথের ওই পেনশনের টাকা থেকেই কেটে-কুটে ছেলের স্কুলের মাইনেটা যুগিয়ে যাচ্ছে, কদাচ কখনও একটু-আধটু বেশী খাবার এনে ছেলের হাতে গুঁজে দিচ্ছে। দোকানই সার হয়েছে তো এখন।

আদিনাথ ওটা নিয়ে মাঝে মাঝেই অভিযোগ তোলেন। বলেন, তুমি বাড়িতে থেকে তো একটা খরচ বাড়াচ্ছ দেখছি দেবু? সকাল হলেই ভোলার দোকানে ছুটবে। আর একগাদা পয়সা নষ্ট করে গুচ্ছির খাবার কিনে আনবে। কেন, বৌমা তো দিব্যি ভাল করে খাওয়াতো। তোমার বুঝি পছন্দ হয় না?

দেবুর ভাব বোঝা ভার। দেবু ভিতরে ভিতরে তুষ হয়ে যাচ্ছে, তবু দেবুর থিয়েটারে আলস্য নেই। দেবু বলে, মজা কি, ওই বেরোলেই ভোলার দোকানটা কেমন টানে। জিলিপি ভাজার গন্ধে ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে যায়। তখন—তখন একটা পয়সা হাতে পেলেই ছুটতাম ভোলার দোকানে—

আদিনাথ হা হা করে হেসে ওঠেন, তুই তো তবু ছেলেবেলায়! আর আমি? ছুটিছাটার দিন হল কি সকাল বেলা ভোলার

দোকানে গিয়ে ঢুকে বসে আছি। এক-একদিন অফিস-ফেরতা ইস্টিশান থেকেও। সেই সময়টা আবার ভোলার হিঙের কচুরি ভাজার সময়। গোনা-গুনতি না করে মেরে দিতাম যত ইচ্ছে, তারপর বলতাম হিসেবটা লিখে রাখিস ভোলা, সকালে যাবার পথে দিয়ে যাব। আর দেরি করলে তোদের খুড়ি ভাববে। একটু থেমে বলেন, এখন আর হিঙের কচুরি ভাজে না?

দেবনাথ একটু ঢোক গিলে বলে, সন্ধ্যের দিকে ওদিকে যাই না বড়।

আহা সে তো এখন। অফিস খোলা ছিল যখন?

ভাজতো বৈকি! মাঝে মাঝে ঠোঙায় করে নিয়ে আসত দেবনাথ। যেদিন ছটার ট্রেনটায় এসে যেতে পারত, মাধুরীর কাছে নামিয়ে দিয়ে চুপি চুপি বলত, আদার রস দিয়ে বেশ ফাইন করে একটু চা কর না, মৌজ করে খাওয়া যাক দুজনে।

এটা বাবার কানে তুলত না, কারণ বাবার কানে উঠলেই ওই নিভৃতির সুখটুকু ঘুচে যাবে। আদিনাথ বলবেন, আনলিই যখন আর কিছু বেশী করে আনলি না কেন? বৌমা রাতের রান্না থেকে রেহাই পেত। আমি প্রায়ই এভাবে তোর মাকে ছুটি করিয়ে দিতাম। তারপর সব কখানি হয়তো মেরে দেবেন।

অত কথা, অত গোলমাল, অত উপস্থিতি সব সময় ভাল লাগে না। যতই বাবার সম্পর্কে শ্রদ্ধা সমীহ ভালবাসা থাক।

কিন্তু সেই সব দিন কি সত্যিই ছিল দেবনাথের জীবনে? অফিস যেত সে, অফিস থেকে ফিরত, ছটার ট্রেনটা ধরতে পারলে নিজেকে সেদিন ভাগ্যবান ভাবত। ছুটির দিনটা উৎসবের দিন বলে মনে হত।

সেদিন থেকে আর বদনের দোকানে যাননি আদিনাথ, সুবলেরও তেমন গা নেই, নিজেরও আগ্রহ নেই। হঠাৎ একদিন বেহারী-ডাক্তারের কাছে যাবার পথে ধরল বদন দাস, খুড়োমশাই, আর

আমার ওদিকে যানটান না যে ?

আদিনাথের তো শব্দের মধ্যেই সব, দাঁড়িয়ে পড়ে বলেন, কে, বদন নাকি ? হ্যাঁ যাওয়া-টাওয়া আর হচ্ছে না, ভাবি যাব-যাব। নাতির আবার আজকাল পড়াটড়া বেড়েছে তো ? বুড়োকে নিয়ে কত আর—

তা আপনার ছেলে তো প্রত্যেক দিনই যায়, চলে যেতে পারেন তার হাত ধরে।

বদনের কথার মধ্যে বেহারীর মতো মমতার সুর নেই, বদন যেন কেমন হুল ফোটায়।

হাত ধরে !

যেন 'তার সঙ্গে বলা' যায় না ? দেবুর হাত ধরে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন ভাবতেই কেমন যেন বিরূপতা এসে যায় আদিনাথের।

বদনের ওপরই বিরক্তি আসে।

হঠাৎ তেতো গলায় বলে ওঠেন, কেন, তোমার চায়ে হঠাৎ এত কি মধু ঝরল যে রোজ দেবু তোমার চা খেতে যায় ?

বদন বেশ আমোদ অনুভব করে।

দৃষ্টিহীন মুখের যে স্বাভাবিক অসহায়তা, সেখানে রাগ ফুটলে কেমন বোকাটে বোকাটে লাগে, কৌতুকের খোরাক একটা।

তাই বদন আমুদে গলায় বলে, চা খেতে ? হুঁ তেমনি বাজে খরুচে ছেলে বটে আপনার ! চা-টা নয়, যায় শুধু খবরের কাগজের ধান্ধায়। চারখানা করে কাগজ পায় তো—

আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল বদন, তাকে সে সুখ থেকে বঞ্চিত করে কোথা থেকে মাছের চুপড়ি কাঁখে মুক্ত জেলেনী এসে উদয় হয়। চিল-চেঁচানো গলায় বলে ওঠে, খুড়ো মশায়ের কাছে মুক্তর কি অপরাধ হল বলেন তো ? আপনার বৌমা আমায় বাড়ির চৌকাঠ মাড়াতে দেয় না, রাস্তা থেকে হাত নেড়ে ভাগায় !

আদিনাথ একটু হতচকিত হন।

আদিনাথের এখন মনে পড়ে, অনেকদিনই যেন মুক্তর শানানো

গলা তাঁর উঠোনে এসে আছাড় খায়নি—'অ বৌদিদি, মাছ রাখবে নাকি? সত্ত টাটকা কই আছে, পুঁটি আছে, ল্যাঠা আছে'—অথবা 'অ বৌদিদি, শীগগির এসো দিকিন বাসন নিয়ে, এই গোটা চার-পাঁচ খলশে আছে। খুড়োমশাইয়ের জন্যে রাখো। কী খলশে! একেকটি এক পোয়া!

খলশে, খরশোলা, বাটা, ফলুই, কুচো চিংড়ি, এই সবের কারবারি মুক্ত। রুই-কাতলার সঙ্গে সম্পর্ক কম। কিন্তু ওই সবই তো স্বাদী মাছ, লুফে নেয় লোকে।

আদিনাথও মুক্তর সাড়া পেলেই তাড়াতাড়ি সাড়া করতেন, কে মুক্ত নাকি? কী আছে আজ তোর চুপড়িতে?

তা অনেকদিনই যেন সে-সব হচ্ছে না।

আশ্চয্যি, মনেও তো পড়েনি আদিনাথের। লজ্জিত গলায় বলেন, আরে না না, ব্যাপার হচ্ছে কি তোর দাদাবাবু তো এখন ছুটিতে রয়েছে। সে নিজেই বাজার-টাজার করছে, দরকার হচ্ছে না।

কোথায়? দাদাবাবুকে তো আমাদের বাজারেও দেখি না। তাহলে ইস্টিশানের ওদিকে যে চালানি মাছের বাজার বসে, সেইখানে যায় বোধহয়।

আরে গেল যা—

আদিনাথ ক্রুদ্ধ গলায় বলেন, দেবুর আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই। সে চালানি মাছ আনতে ইস্টিশানে ছুটবে।

বদন দাস আর মুক্তকেশীতে একটি কৌতুক দৃষ্টি বিনিময় হয়। অর্থাৎ বুড়ো ক্ষেপেছে।

মুক্ত বলে, তবে মুক্তরই কোনো অপরাধ ঘটেছে। নচেৎ পাড়ার মধ্যে আপনার বাড়িটাই আমার একটা বড় খদ্দেরের ঘর ছিল।

মুক্ত চলে যায়, বদন দাসও সরে পড়ে। আদিনাথ কি একটা বলতে যান, সুবল হেসে উঠে বলে, ফোক্কা, ফোক্কা, চলে গেছে। তোমার কি কষ্ট দাহু! লোকেরা নাকের সামনে চলে গেলেও তুমি টের পাও না!

আদিনাথ হঠাৎ হাতটা তার হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলে ওঠেন, তুই বাড়ি যা। এটুকু আমি একাই যেতে পারব। এসে গেছে।

বাঃ, তোমায় চেয়ারে বসিয়ে দিতে হবে না বুঝি?

না, হবে না। যত দিন যাচ্ছে, অসভ্য আর ফাজিল হয়ে যাচ্ছে —বলে লাঠি ঠকঠক করতে করতে এগিয়ে যান।

সুবলেরও রাগ হয়, সে বলে ওঠে, খুব যে! বেশ, যাও না, গরুর সঙ্গে ধাক্কা খাবে যখন বুঝবে ঠ্যালা!

কিন্তু আদিনাথের কপাল। গরুর সঙ্গে ধাক্কা খান না। ধাক্কা খান একটা জলজ্যান্ত লোকের সঙ্গে।

মরণ আর কি, চোখে দেখতে পায় না—বলেই শশব্যস্তে জিভ কাটে সদু, আ আমার মরণদশা, দাদাঠাকুর! ওই গরুটাকে হেট হেট করতে করতে আসছি তো, দেখতে পাইনি। অপরাধ নেবেন না দাদাঠাকুর!

অপরাধ আবার কি রে? আদিনাথ কেমন একরকম হেসে বলেন, কানাকে কানা বলবি না তো কি পদ্মপলাশলোচন বলবি?

সদু বলে, একা যে?

আদিনাথ হঠাৎ বলে ওঠেন, আজকাল মাঝে মাঝে সাহস করে একাই হাঁটছি রে সদু, মাঝে মাঝে মনে হয় চোখে যেন একটু দেখতে পাচ্ছি।

ওমা, তাই নাকি? সদু অবাক গলায় বলে, দৈব-টৈব কিছু করেছেন নাকি?

না, সে-সব কিছু না, আদিনাথ বলেন, এমনিই মনে হয়।

সদু বলে, তা হতে পারে, আপনার শরীল স্বাস্থ্যটি ভাল তো। ভোগের শরীল, চলে যাওয়া দিষ্টিটি ফিরে আসছে। মুখপোড়া হাসপাতালের ডাক্তারের দোষেই তো গেছলো! তা জ্যান্ত মাছ-টাছ একটু বেশী করে খাবেন দাদাঠাকুর। পাঁঠার মুড়ি-টুড়িও উপগারী—

আদিনাথের হঠাৎ মনে হয় তিনি যেন সদুর মুখটা স্পষ্ট দেখতে পেলেন। গোল গোল বাটি-বাটি মুখ, ছোট করে চুল ছাঁটা, কপালে উল্কি।

আদিনাথের ইচ্ছে হল, সন্তুকে একটু হাত দিয়ে স্পর্শ করেন। অদ্ভুত ইচ্ছে, অসঙ্গতই বা নয় কেন ?

তবু হাতটা বাড়ালেন আদিনাথ, কিন্তু হাতটা শুধু শূন্যে প্রসারিত হল। সন্তু ততক্ষণে হনহনিয়ে অনেক দূরে চলে গেছে।

আস্তে আস্তে বেহারী ডাক্তারের চেম্বারে এসে ঢুকলেন।

বেহারী বেজার মুখটা বাঁকিয়ে, পালিশ গলায় বলে উঠল, এই যে, আসুন। এত দেরি যে ?

আদিনাথ নিজেই আন্দাজে চেয়ারে বসে পড়ে বলেন, রাস্তায় রাজ্যির লোকের সঙ্গে দেখা—

বলেই হঠাৎ অস্বাভাবিক জোরে হেসে ওঠেন, ওই দেখ, আবার সেই ভুল। দেখা না বলে ধাক্কা বলাই উচিত, কী বল ? তা আজকাল তো একটু-আধটু একাই হাঁটছি হে! মনে কেমন একটা সাহস এসে গেছে—

বেহারী ডাক্তার আদিনাথকে নিত্য যে ওষুধটা দেয়, সেটা হচ্ছে 'সুগার অফ্ মিল্ক' কাজেই বেহারীর মনে প্রত্যাশার প্রশ্ন নেই, কাজে কাজেই বেহারীকে উৎফুল্ল স্বরের চাষ করতে হয়, আসবেই তো, ওটাও উন্নতির একটা লক্ষণ। আপনিই আমার মুখ রাখবেন চাটুয্যে মশাই!

আদিনাথ যেন ঝিমিয়ে যান, বলেন, আচ্ছা বেহারী, কানা-অন্ধতেও করতে পারে তোমার জানা-শোনায় এমন চাকরি আছে ?

তার মানে ? বলে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বেহারীও হঠাৎ জোরে জোরে হেসে ওঠে, হঠাৎ এ খেয়াল যে ?

হঠাৎ নয়, অনেকদিন থেকেই ভাবছি। এদিকে হেল্‌থটা ভালই রয়েছে, অথচ হাত-পা কোলে নিয়ে রাতদিন বসে আছি। দিন যেন আর কাটতে চায় না। চোখটা থাকলে—

বেহারী গম্ভীরভাবে বলে, হবে। কিন্তু চোখ-কান ভাল থাকলেও এই বয়সে কেউ চাকরি করে চাটুয্যে মশাই ?

করে না, কিন্তু আমার করলে ভাল হত।

কেন, আপনি তো আর পরমুখাপেক্ষী নয় দাদা? সরকার আপনাকে যা দেয়, আপনার একার হেসে-খেলে চলে যাবার কথা।

আহা, সে তো যাচ্ছেই, দেবুও যোগান দিচ্ছে তার ওপর, এই তো সেদিন এক জোড়া ধুতি এনে দিল, একদিন ফতুয়া এনে দিল, ক মাস যেন আগে গামছা আর চটি কিনে আনল—

এসব যে দেবু নিজের গাঁটের কড়ি খরচা করে আনে না, তা কি জানেন না আদিনাথ? তবু ওই ভাবেই বলেন।

বেহারী বলে, তা তো করবেই, সৎ ছেলে আপনার, পিতৃভক্ত। ভগবান ওর আরও উন্নতি দিন। তা ওর অফিসে সেই স্ট্রাইক্ এখনও চলছে নাকি?

চলছেই তো। এ বলে নেহি ছোড়েঙ্গা ও বলে নেহি ছোড়েঙ্গা।

আদিনাথ চঞ্চল হয়ে উঠে পড়েন।

এই চাঞ্চল্যটা নতুন হয়েছে।

এটা ছিল না, যেখানে বসতেন সেখানেই জমিয়ে বসতেন। কিন্তু আজকাল যেন কোনখানে তিষ্ঠোতে পারেন না।

বেহারী ডাক্তার বুঝতে পারলে নির্ঘাত বলবে ওটা উন্নতির লক্ষণ।

তাহলেও একা আর নাই গেলেন, পথে ঢিল পাটকেল থাকতে পারে—

না না, এই তো এলাম।

বলে আস্তে আস্তে বেরিয়ে পড়েন আদিনাথ। সুবলের মধ্যে যে একটা ছাড়া-ছাড়া ভাব এসে গেছে সেটা বেশ বুঝতে পারছেন আদিনাথ। তাই তাকে আর সাধ্যপক্ষে জড়াতে ইচ্ছে করে না। সত্যিই তো কতই আর ভাল লাগে ছেলেমানুষের? তার লেখাপড়া আছে, খেলাধুলো আছে। একটা বুড়োকে অবিরত টানা!

কিন্তু শুধু কি ওইটুকুই বুঝতে পারেন আদিনাথ? আর কিছু না?

আস্তে আস্তে লাঠি ঠুকে ঠুকে নিজের বাড়ির দিকে যান। চিরপরিচিত রাস্তা, আচ্ছন্নের মধ্যেও ঠিকই চলেন, পোঁছেও যান। আন্দাজে আন্দাজে বেড়ার দোরটা খোলেন।

দেবনাথ উঠোনে মাটি কুপিয়ে শাকের চারা লাগাচ্ছিল, দাওয়ার ধারে কটা কাঁচা পেঁপে রেখেছে গাছ থেকে পেড়ে। পেঁপে গাছগুলোই রক্ষে দিচ্ছে, বিনা যত্নে বাড়ে। অথচ ফল দেয় প্রচুর। প্রথম প্রথম দেবনাথ ঠাট্টা করে বলত মাধুরীকে, সব মন্দের মধ্যেই একটা ভাল থাকে, কাঁচা পেঁপে খেয়ে খেয়ে আমার অজীর্ণ সেরে গেল, এখন সর্বদাই ঘর খাই বাড়ি খাই খিদে।

কিন্তু এখন যেন সেটুকু কৌতুকেরও আর ক্ষমতা নেই। শুধু পেড়ে পেড়ে এগিয়ে দেয়।

বেড়ার দরজায় শব্দ হতেই দেবনাথ চমকে তাকায়, তারপর উঠে দাঁড়ায়। বাবা একা আসছেন বলে হৈ চৈ করে ওঠে না, নিঃশব্দে সরে এসে দাওয়ার ধার থেকে পেঁপে কটা নামিয়ে সরিয়ে রাখে। ওইখান দিয়েই উঠবেন তো।

আদিনাথ ঘ্রাণশক্তিটাকে একটু বাড়াতে চেষ্টা করেন, বুঝতে চেষ্টা করেন, রান্নাঘর থেকে পরিচিত সৌরভ ভেসে আসছে কিনা। বুঝতে পারেন না। না গন্ধ, না শব্দ।

বাড়িটা যেন পোড়ো-বাড়ি পোড়ো-বাড়ি লাগছে, আদিনাথের যেন ভয়-ভয় করে, কে যেন তাঁকে তাঁর এই অন্ধকারের ভূমি থেকে অধিকতর অন্ধকারের গহ্বরে ঠেলে ফেলে দিতে চায়, আদিনাথ লাঠি ধরা ডান হাতটা লাঠিতে চেপে বাঁ হাতটা সামনে বাড়িয়ে কিছু যেন একটা ধরতে চেষ্টা করেন, দেবনাথ ঈষৎ চঞ্চল হয়, এগিয়ে গিয়ে ধরবে কিনা ভাবে, কিন্তু ততক্ষণে আদিনাথ দাওয়ার খুঁটিটা ধরতে পেরেছেন।

দেবনাথ সরে আসে।

করুণ মমতার দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে। অথচ দেবনাথের পক্ষে আদিনাথকে করুণার দৃষ্টিতে দেখা এক হিসেবে হাস্যকরই। দেবনাথের হাড়-পাঁজড়া বার করা জীর্ণ গেঞ্জি-পরা লটপটে দেহটার কাছে আদিনাথের দীর্ঘোন্নত বলিষ্ঠ দেহটা যেন অদ্ভুত রকমের বেমানান দেখতে লাগে।

আদিনাথের পরনে ফর্সা ধবধবে ধুতি, ফর্সা নতুন ফতুয়া, আদিনাথের পায়ে ভাল চটি। চকচকেও। দেবনাথ বাড়ি থাকে বলে মাঝে মাঝেই বাবার চটিটা বুরুশ করে রাখে।

ওই ছেঁড়া গেঞ্জি আর ফুটো লুঙ্গি পরা দেবনাথকে আদিনাথের বাড়ির চাকরটাকরের মতন দেখতে লাগছে, তবু দেবনাথ আদিনাথের দিকে করুণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে।

শুধু মাধুরীর চোখে আজকাল আর এ দৃষ্টি ফোটে না। মাধুরী বিড়বিড় করে বলে, চোখ ঘুচে গিয়ে ভালই হয়েছে, শাপে বর হয়েছে, তোফা খাচ্ছেন, মাখছেন, সাজছেন, গুজছেন, বেড়াচ্ছেন-টেড়াচ্ছেন, তাকিয়ে দেখতে হলে যে চক্ষুলজ্জাটুকু আসত, তার বালাই নেই। আমি তো বলি এ দিব্যি সুখের অবস্থা।

কিন্তু সে তো বিড়বিড় করে।

কিন্তু দেবনাথ কেন এগিয়ে এল না? কেন একা আসার জন্যে বাবাকে অভিযোগ আর ছেলের উদ্দেশে তিরস্কার করল না?

শুধু তাকিয়ে রইল কেন বাবার গতিবিধির দিকে? কথা কওয়াটাই ক্লান্তিকর হয়ে গিয়েছে বলে?

আদিনাথ গায়ের ফতুয়াটি খুলে টাঙিয়ে চৌকিতে বসে পড়ে আস্তে হাতপাখাখানা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাওয়া খেতে থাকেন। দেবনাথ একটু অবাক হয়েই দেখে, বাবা চৌকির কাছে রাখা বাক্সের উপর থেকে পাখাখানা দিব্যি চক্ষুষ্মানের মতোই তুলে নিলেন। বাবার চওড়া কব্জিটার দিকে তাকিয়ে দেবনাথের একটা নিশ্বাস পড়ল।

একটুক্ষণ হাওয়া খাওয়ার পর আদিনাথ কেমন যেন কাঁপা কাঁপা গলায় ডাকলেন, বৌমা!

মাধুরী ঘরের মধ্যে থেকে বিড়বিড়িয়ে বলল, দু'দণ্ড বেঁচেছিলাম, আবার শুরু হল বৌমা-বৌমা। বৌমা মরে গেছে। বৌমাকে তেঘাটার শ্মশানে নিয়ে গেছে।

তারপর বেরিয়ে এসে নীরস গলায় বলল, কী বলছেন?

বলছি বাড়িটা এমন ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা কেন? সাড়া নেই শব্দ নেই—

মাধুরী তেমনি মাধুর্যহীন গলায় বলে, সাড়া-শব্দ আর কিসের থাকবে ?

কেন, এ সময় তো রান্নাবান্নার শব্দটব্দ—

হয়ে গেছে রান্না।

হয়ে গেছে ? ওঃ।

আদিনাথ একটু থেমে বলেন, দেবু বাড়ি নেই ?

আছে।

আছে ? কোথায় ?

দেবু সামনেই রয়েছে, তবু মাধুরী তাচ্ছিল্যের গলায় বলে, বাগানের ওদিকে কোথাও বোধ হয়।

সুবল ইস্কুলে চলে গেছে ?

হ্যাঁ।

ফিরে এসে কিছু বললো নাকি ?

মাধুরী যেন একটা যন্ত্র-মানুষ, তাকে কল টিপে যেটুকু কথা জিজ্ঞেস করবে, ঠিক সেইটুকুই উত্তর দেবে।

তাই মাধুরী বলে, কী বলবে ?

এই দাদু হাতছাড়িয়ে একা একা চলে গেল, আমায় ভাগিয়ে দিল—

না।

কিচ্ছু বলেনি ?

না।

আদিনাথ কষ্টে আত্মসংবরণ করছিলেন, তবু শেষরক্ষা হয় না— হঠাৎ ধৈর্যচ্যুতি ঘটে যায়। সেই কাঁপা আর ভাঙা গলায় আচমকা চেঁচিয়ে ওঠেন, তোমার আজকাল কী হয়েছে বল তো বৌমা ? কথা কও যেন বাড়ির চাকরবাকরের সঙ্গে। কানা অন্ধ যাই হই, আমি তোমার শ্বশুর তা মনে রেখো।

দেবনাথ এই আচমকা চীৎকারে চমকে উঠে তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসে। যদিও নিঃশব্দেই। এসে মাধুরীর দিকে তীব্র ভৎর্সনার চোখে তাকায়। কিন্তু মাধুরী ঢোঁড়া সাপের ফণা তোলাকে ভয় পায়

না। যে পুরুষ চাকরি খুইয়ে বাড়ি বসে থেকে পরিবারের গহনা বিক্রি করে খাচ্ছে, আর ন্যাকামি করে পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছে, সে পুরুষের ভর্ৎসনার দৃষ্টি গায়েই মাখে না সে।

একজোড়া দৃষ্টিসম্পন্ন আর একজোড়া দৃষ্টিহীন চোখের আগুনের সামনে অবলীলায় বলে, অনেক মনে রেখেছি। বলে ফের ঘরেই ঢুকে যায়।

আদিনাথ চৌকি থেকে উঠে দাঁড়ান, ভাঙা গলায় চীৎকার করে ওঠেন, দেবু—

দেবুর নীরবতার প্রাচীর ধসে পড়ে, দেবু ছুটে আসার ভঙ্গীতে বলে, বাবা ডাকছো ?

আদিনাথ হাত দুটো বাড়িয়ে দিলেন। যেন ছেলের ওই কণ্ঠস্বরটাকেই চেপে ধরেন, কিছুক্ষণ আগের দাওয়ার খুঁটিটা চেপে ধরার ভঙ্গীতে।

দেবু এগিয়ে আসে, হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বাবাকে ধরে।

ধরে তার ওই হাড়-জিরজিরে শরীরে যতটা জোর থাকা সম্ভব তার জোরেই, অথচ আদিনাথের দীর্ঘ বিশাল দেহটা থরথর করে কাঁপছে।

দেবু ভয় পায়, বাবা যদি টাল রাখতে না পারেন ! ও যে সামলাতে পারবে এমন ভরসা নেই। দেবু চাপা খাটো গলায় বলে ওঠে, একবার এদিকে আসবে ?

আদিনাথ ছেলের হাতটা ছেড়ে দিয়ে আন্দাজে পাশের একটা জানলার কপাট চেপে ধরেন, শান্ত গলায় বলেন, থাক্ থাক্, কাউকে আসতে হবে না। আমি তোমার কাছেই একটা কথা বলতে চাই। দেবু, আমাকে তোমরা একটা আশ্রমে-টাশ্রমে পাঠিয়ে দিতে পার ? কানা-অন্ধদের আশ্রমে ?

বাবা ! দেবু চৌকিতে বসে পড়ে ব্যাকুল গলায় বলে, এ সব কী বলছ বাবা ?

ঠিকই বলছি দেবু—

আদিনাথ আরও স্থির শান্ত গলায় বলেন, একটা অন্ধকে নিয়ে তোমরা আর কতদিন ভুগবে ?

বাবা! দেবুও আস্তে বলে, আমাদেরও একদিন এরকম দিন আসতে পারে বাবা!

দেবু! আদিনাথের সব শক্তি ধূলিসাৎ করে দিয়ে এক ঝলক জল চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে।

আদিনাথ তারপর প্রায় শব্দ করে কেঁদে ওঠেন।

দেবু বলে, বাবা, আমরাই তোমাকে কিছু—

আদিনাথ হাত তুলে তাকে থামান। নিজেকে সামলে নিয়ে আবার শান্ত গলায় বলেন, থাক দেবু, আর কষ্ট করে কথা বানাতে বসিস না বাবা, ভগবান আমার বাইরের চোখটাই কেড়ে নিয়েছে, কিন্তু সত্যি তো আর অন্ধ নই! বৌমার জ্বালাটা আমি বুঝতে পারি বৈকি। হঠাৎ কেমন আপ্‌সেট হয়ে গিয়ে—আমি কি জানি না কত দিন হল তোর চাকরি নেই! আমার বোজা চোখের সামনে তোরা রাজার ভোগ ধরে দিচ্ছিস, আর নিজেরা শাক-ভাত খাচ্ছিস, আর আমাকে বোঝাচ্ছিস যেন তোরাও ওই সব ভাল-মন্দ খাচ্ছিস।··· আমি সব বুঝতে পেরে গেছি দেবু।···আমি কি বুঝতে পারি না, বেহারী ডাক্তার আমায় নিয়ে খেলা করে, আর ভাবে এইভাবে খেলিয়ে খেলিয়ে যে কটা দিন বুড়োকে ভুলিয়ে রাখতে পারি। সব জানি দেবু, সব বুঝি, সবাই আমায় দয়া করে, তবু আমি সকলের কাছে অন্ধের ভান করে থাকি।···না থাকলে, আমি কিসের ওপর দাঁড়িয়ে থাকব বল্? ওই ভানটুকুই যে আমার পায়ের তলার মাটি। এ মাটিটা হারালে আর আমার কী থাকবে দেবু?

বোজা চোখের কোণ দিয়ে আস্তে জল গড়িয়ে পড়ে, নিঃশ্বাস ফেলে আস্তে বলেন, আর আমার কিছু থাকল না।

দেবুর নিঃশ্বাস পড়ে না। দেবু পাথর হয়ে গেছে।

পাথরের চোখ মেলেই তাকিয়ে থাকে দেবু ওই দৃষ্টিহীন চোখ দুটোর দিকে।

শেষ